

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৪৯

প্রকাশক

বামাচরণ মুখোপাধ্যায়

করুণা প্রকাশনী

১৮।এ, টেমার লেন

কলকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী

সুব্রত চৌধুরী

মুদ্রাকর

এইচ. পি. রায় এ্যাণ্ড কোং

৭৩/এ, আমহার্স্ট রো

কলকাতা ৭০০০০৯

কুড়ি টাকা

সুধাংশু ঘোষ
বন্ধুবরেষু

স্বর্গের এক বাসিন্দা

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

কেয়াপাতার নৌকো (১ম ও ২য়)

ভাতের গন্ধ

মানুষের যুদ্ধ

সীমারেখা মুছে যায়

এইমাত্র বিশাল মেল ট্রেনটা মধ্যপ্রদেশের মাঝারি ধরনের একটা স্টেশনে এসে থামল। ট্রেনটা আসছে হাওড়া থেকে, যাবে বোম্বাই। এই স্টেশনে মিনিট পাঁচেক জিরিয়েই আবার তার দৌড় শুরু হবে।

তাড়াহুড়োর কিছু নেই। এত বড় মেল ট্রেনটা থেকে তিরিশ চল্লিশ-জনের বেশি লোক এখানে নামে না, ওঠে তার চাইতেও কম।

ব্রিটিশ আমলের আই সি এস স্টিফেন লারউড একটা ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেণ্টে জানলার ধার ঘেঁষে বসেছিলেন। তাঁর চোখ ছুটো বাইরে ফেরানো। অসীম আগ্রহ নিয়ে তিনি চারদিকের দৃশ্য-টৃশ্য দেখছিলেন।

কলকাতা থেকে সাতশো কিলোমিটার দূরে মধ্যপ্রদেশের এই জায়গাটায় এখন সূর্যোদয় হচ্ছে। দূরে পেন্সিলের আঁচড়ের মতো উঁচুনীচু পাহাড়ের রেঞ্জ। তার ওপার থেকে সোনার থালার মতো গোল সূর্যটা উঠে আসছে।

সময়টা নভেম্বরের মাঝামাঝি। শীত পড়তে এখনও কিছু বাকী। তবু এরই মধ্যে এখানকার বাতাসে হিমের গুঁড়ো মিশতে শুরু করেছে। চারদিকে মিহি সিল্কের মতো কুয়াশা ছড়িয়ে আছে। ভোরের হাওয়ায় এখন গায়ে কাঁটা দেয়।

সূর্যোদয়টা এখন হলেও ঘণ্টা দেড় ছুই আগেই ঘুম ভেঙে গিয়ে-ছিল স্টিফেন লারউডের। উঠে মুখ-টুখ ধুয়ে হোল্ড-অল বেঁধে জানলার বাইরে তাকিয়ে বসে আছেন।

কাল রাত্তিরে লারউড যখন হাওড়ায় ট্রেনে উঠেছিলেন তখন থেকেই এক ধরনের উত্তেজনা অনুভব করতে শুরু করেছেন। ট্রেনটা পশ্চিম-

বাংলা, বিহার-টিহার পার হয়ে যত এগুচ্ছিল ততই উত্তেজনা বেড়েই যাচ্ছিল। সেই সঙ্গে মিশে ছিল আশ্চর্য একটু আনন্দ বা সুখ।

সারা রাত ভালো ঘুম হয়নি লারউডের। তন্দ্রার মতো একটা ভাব হয়েছিল শুধু। আর তার মধ্যেই মধ্যপ্রদেশের এই স্টেশনটার গায়ে একটা ডিস্ট্রিক্ট টাউনের কথা বার বার মনে পড়েছে।

লারউড নাইন্টিন টোয়েন্টিনাইনের আই.সি.এস.। ভারতে এসে কিছু দিন এ-জায়গায় সে-জায়গায় ঘুরে মধ্যপ্রদেশের ওই শহরে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এসেছিলেন। সিভিল সার্ভিসের শেষ দশটা বছর অর্থাৎ উনিশশো সাতচল্লিশের জুলাই মাস পর্যন্ত তিনি ওখানেই কাটিয়ে গেছেন। ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্সের এক মাস আগে তিনি এ দেশ ছেড়ে লণ্ডন চলে যান। তারপর সাতাশ বছর বাদে এই উনিশশো চুয়াত্তরে আবার এখানে এসেছেন। কিন্তু পুরনো দিনের কথা এখন নয়, পরে।

লাল উর্দি-পরা পোর্টারদের চিৎকারে চমকে উঠলেন লারউড। ট্রেনের জানলায় জানলায় মুখ বাড়িয়ে তারা হেঁকে যাচ্ছিল, 'কুলী সাব, কুলী—

লারউড পোর্টারদের ডাকলেন না। ছেলেবেলা থেকেই নিজের কাজ নিজের হাতে করার, অভ্যাস তাঁর। যখন তিনি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট তখন তাঁর চারদিকে গণ্ডা গণ্ডা আর্দালি কি বয়-বেয়ারা, কিন্তু ছোট-খাটো মালপত্র পারতপক্ষে কাউকে ছুঁতে দিতেন না। নিজেই হাতে ঝুলিয়ে বা কাঁধে ফেলে নিয়ে যেতেন। বলতেন, 'অন্যের ওপর বেশি ডিপেণ্ড করা ঠিক নয়। খানিকটা সেল্‌ফ-হেল্পের স্পিরিট থাকা ভালো। হোল লাইফ তো সিভিল সার্ভিসে থাকব না।'

ধীরে সুস্থে উঠে ফাইবারের একটা মাঝারি স্যুটকেশ আর হোল্ড অল দু'হাতে ঝুলিয়ে বাইরের প্ল্যাটফর্মে নেমে এলেন। আর তখনই শুক্লাজীর কথা মনে পড়ে গেল তাঁর। নারায়ণদাস শুক্লা।

ক'দিন আগে লণ্ডন থেকে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের প্লেনে কলকাতায় পৌঁছেই নারায়ণদাসকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন আজ তিনি এখানে

আসছেন। নারায়ণদাস যেন তাঁর জন্য কোন হোটেল বা গভর্নমেণ্ট রেস্ট হাউসে দিনকয়েক থাকার ব্যবস্থা করে রাখেন, আর সম্ভব হলে স্টেশনে তাঁকে নিতে আসেন। যদিও এ শহরের প্রতিটি বাড়িঘর, গাছ-পালা এবং রাস্তার প্রতিটি ধুলো লারউডের চেনা কিন্তু সে তো স্বাধীন-তার আগের কথা। ইণ্ডিপেণ্ডেন্সের সাতাশ বছর পর নিশ্চয়ই সেই ধমতোরি শহর আর নেই, তার অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। এই বদলে-যাওয়া শহরে লারউড সাহেবের পক্ষে রাস্তাঘাট চিনতে অবশ্যই খুব অসুবিধা হবে। ইত্যাদি ইত্যাদি—

কিন্তু প্ল্যাটফর্মে নামার পর হঠাৎ লারউডের খেয়াল হল, নারায়ণ-দাস শুক্লা তাঁর চিঠি পেলে নিশ্চয়ই স্টেশনে ছুটে আসবেন। কিন্তু তিনি কি এখনও বেঁচে আছেন?

ইণ্ডিয়ায় লারউডের যে ক'জন বন্ধুবান্ধব আছেন নারায়ণদাস তাঁদের একজন। অথচ তাঁদের ছু'জনের মধ্যে কত তফাতই না ছিল এক সময়! ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্সের আগে লারউড ছিলেন একজন জবরদস্ত ব্রিটিশ সিভিলিয়ান আর নারায়ণদাস একজন গান্ধীবাদী স্বাধীনতা সংগ্রামী। দেশের জন্য এই আইডিয়ালিস্ট মানুষটি নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু এ সব কথাও পরে।

লারউডের মনে পড়ল, নারায়ণদাস তাঁর চাইতে চার পাঁচ বছরের বড়। তাঁর এখন সাতষট্টি চলছে। হিসেব অনুযায়ী নারায়ণদাসের একাত্তর বাহাত্তর। এটা খুব একটা কম বয়স নয়। তবে লণ্ডনে থাকতে লারউড মাঝে মধ্যে ইণ্ডিয়া হাউসে গিয়ে এদেশের কাগজপত্র পড়তেন। কোথায় যেন পড়েছিলেন স্বাধীনতার পর ভারতীয়দের গড় আয়ু বেড়ে গেছে। তা হলে নারায়ণদাস বেঁচে থাকলেও থাকতে পারেন।

চারদিকে নারায়ণদাসকে খুঁজতে খুঁজতে চৌকো চৌকো পাথর-বসানো বিশাল প্ল্যাটফর্মের ওপর দিয়ে স্টেশন গেটের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন লারউড। এই সাতষট্টি বছর বয়সেও এক ইঞ্চি মুয়ে পড়েন নি তিনি। ছ'ফুটের ওপর হাইট। চওড়া চওড়া হাড়ের ফ্রেমে

টান টান সমুন্নত শরীর। গায়ে এক গ্রাম অনাবশ্যক মেদ নেই। বিশাল মাংসল কাঁধ তাঁর, বিয়াল্লিশ ইঞ্চি মতো বুক, সরু কোমর। বয়স অদৃশ্য নখে অবশ্য চামড়ায় সরু সরু আঁচড় বসিয়ে দিয়েছে, চুল উঠে উঠে কপালটা মাঠের মতো। চোখে পুরু লেন্সের বাইফোকাল চশমা। ব্যস, এই পর্যন্ত। সময় বা বয়স এর বেশি আর কিছু করে উঠতে পারেনি।

লারউড এধারে নারায়ণদাসকে খুঁজছিলেন ঠিকই কিন্তু তারই ফাঁকে তাঁর চোখে অনেক কিছু পড়ছিল। সাতাশ-আটাশ বছর আগে স্টেশনটা এত বড় ছিল না। এই প্ল্যাটফর্ম ছিল আরো নিচু, আরো ছোট। পাথরের জায়গায় সেখানে তখন লাল সুরকি ছড়ানো। এখন যেখানে বিরাট দোতলা স্টেশন বিল্ডিং স্বাধীনতার আগে ঠিক সেই জায়গাতেই ছিল একটা ছোট অ্যাসবেস্টসের শেড। তবে প্ল্যাটফর্মের একধারে সেই ঝাঁকড়া-মাথা বিরাট রেন-ট্রিটা এখনও রয়েছে। লারউডের আরো চোখে পড়ল, ওধারেও আরেকটা বড় শেড দেওয়া প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে। সেটার তলায় টী-স্টল, ফলের দোকান, পুরী-কচৌরি-মেঠাইর দোকান, ইত্যাদি ইত্যাদি। তাছাড়া লাইসেন্স-প্রাপ্ত অন্যান্য ভেণ্ডারদেরও দেখা যাচ্ছে। তাদের কেউ মোমফালি, কেউ সান্তারা, কেউ বা নানা ধরনের খাবার-দাবার সাজিয়ে বসে আছে। পারাপারের জন্য দুটি প্ল্যাটফর্মের মাঝখানে নতুন ওভারব্রিজ বানানো হয়েছে।

সাতাশ বছর আগে এই স্টেশন এত জমজমাট ছিল না। স্টেশনটা দেখে মনে হচ্ছে স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষের বেশ উন্নতি হয়েছে। বাইরের দিক থেকে এ দেশের পরিবর্তন যে অনেকটাই হয়েছে, সেটা কলকাতায় পা দিয়েই টের পেয়েছিলেন লারউড। কলকাতা তাঁ অচেনা জায়গা ছিল না। সাতাশ বছর আগে যখন তিনি মধ্যপ্রদেশের এই জেলার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট তখন অনেকবার কলকাতায় গেছেন। তখনকার কলকাতার সঙ্গে এই নাইন্টিন সেভেন্টিফোরের কলকাতার অনেক তফাত।

হাঁটতে হাঁটতে গেটের কাছাকাছি চলে এসেছিলেন লারউড। হঠাং

একটা গলা শোনা গেল, 'স্যার—'

চমকে তাকাতেই লারউড দেখতে পেলেন সামনের দিক থেকে একটি বৃদ্ধ লম্বা লম্বা পা ফেলে প্রায় ছুটতে ছুটতে এগিয়ে আসছেন। তাঁর পাশে একটি চব্বিশ-পঁচিশ বছরের সুপুরুষ যুবককে দেখা গেল।

বৃদ্ধের বয়স সত্তর-বাহাত্তর। মেরুদণ্ড বেঁকে সামনের দিকে কিছুটা নুয়ে পড়েছেন। মাথাটা বকের পাখার মতো সাদা ধপধপে। গায়ের চামড়া ঢিলে হয়ে কুঁচকে-মুচকে গেছে। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। পরনে মোটা খদ্দেরের ঢোলা পাজামা আর পাঞ্জাবি, তার ওপর খদ্দরেরই জহর কোট, পায়ে সাদা কেড্‌স। এই পাজামা-পাঞ্জাবি এবং জহর কোটই সনাক্ত করে দিল বৃদ্ধটি শুক্লাজী অর্থাৎ নারায়ণদাস শুক্লা ছাড়া আর কেউ নন। তবে তাঁর সঙ্গে যুবকটিকে চিনতে পারলেন না লারউড।

বোঝা গেল নারায়ণদাসরা তাঁকে খুঁজতে ইঞ্জিনের কাছে কামরাগুলোর দিকে গিয়েছিলেন। কিন্তু লারউড ছিলেন ট্রেনের শেষের দিকের কম্পার্টমেন্টে।

ঝকঝকে কাচের ওপর আলো পড়লে যেমন হয়, লারউডের চোখে তেমন কিছু একটা খেলে যাচ্ছিল। নারায়ণদাস কাছে এলে গভীর আবেগের গলায় বললেন, 'কত বছর পর দেখা হল। কি আনন্দ যে হচ্ছে!' বলেই স্যুটকেশ-হোল্ডঅল প্ল্যাটফর্মে নামিয়ে রেখে দুই বিশাল বাহু বাড়িয়ে নারায়ণদাসকে নিজের বুকের গভীরে টেনে আনলেন।

নারায়ণদাসও প্রগাঢ় আবেগে লারউডকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। বললেন, 'আমারও ভীষণ ভালো লাগছে।'

অনেকক্ষণ দুটি বয়স্ক মানুষ পরস্পরের হৃদয়ের শব্দ অনুভব করলেন। তারপর ধীরে ধীরে নিজেদের ছাড়িয়ে নিলেন।

লারউড এবার বললেন, 'ট্রেন থেকে নেমে আপনাকে না দেখে ভাবনা হচ্ছিল—'

মজার গলায় নারায়ণদাস বললেন, 'কি ভেবেছিলেন? আমি

পৃথিবীর মায়া কাটিয়েছি ?'

প্রাণ খুলে জোরে জোরে বেশ শব্দ করে হাসলেন লারউড। বললেন, 'টেলিপ্যাথি জানেন না কি ! ইন ফ্যাক্ট, এ রকম একটা দুশ্চিন্তা যে হয়নি তা বলতে পারব না।' একটু থেমে বললেন, 'কিন্তু এ কী চেহারা করেছেন শুক্লাজী ! একটা চুলও তো কালো দেখছি না, চামড়া কুঁচকে গেছে, সারা মুখে রিঙ্কল। আপনার ঐ খাদির ইউনিফর্ম না থাকলে চিনতেই পারতাম না।'

নারায়ণদাস বললেন, 'চেহারার আর দোষ কি। বয়স তো কম হল না। আই অ্যাম এ গ্র্যাণ্ড ওল্ড ম্যান। তবে আপনি কিন্তু বিশেষ বদলাননি, দূর থেকে থেকেই আপনাকে চিনতে পেরেছিলাম।'

'বয়সকে তাহলে বুড়ো আঙুল দেখাতে পেরেছি, না কি বলেন ?' লারউড শব্দ করে হাসলেন। শিশুর মতোই তাঁর হাসিটি সরল এবং নিষ্পাপ।

এতক্ষণ নারায়ণদাসের সঙ্গের যুবকটি একটি কথাও বলেনি। চুপ-চাপ দুটি বৃদ্ধের কথাবার্তা শুনছিল। তবে তার চোখ আটকে ছিল লারউডের ওপর। স্থির পলকহীন দৃষ্টিতে সে লারউডকে দেখে যাচ্ছিল। এবার সে বলল, 'দাদাজী, তোমরা কি এই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েই সব কথা শেষ করতে চাইছ ?'

নারায়ণদাস একটু বিব্রত হলেন। যুবকটির দিকে ফিরে বললেন, 'না না, এক্ষুনি যাচ্ছি।' তারপর তার কাঁধে সস্নেহে একখানা হাত রেখে সামনে নিয়ে এসে লারউডের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'স্যার, এ হল বিনায়ক, আমার নাতি।' বিনায়ককে বললেন, 'এঁর পরিচয় দেবার নিশ্চয়ই দরকার নেই।'

লারউড একটু ভেবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'নাতি মানে ? কার ছেলে ?'

'আমার তো একটাই ছেলে বিনোদ। ও তার ছেলে।'

এবার মনে পড়ে গেল লারউডের। বললেন, 'বিনোদ কেমন আছে ?'

ভারী গলায় নারায়ণদাস শুক্লা বললেন, 'বিনোদ নেই।'

সামনের দিকে ঝুঁকে উৎকণ্ঠিতের মতো লারউড জিজ্ঞেস করলেন, 'নেই মানে?'

'মারা গেছে।'

'কবে?'

'ফিফটিফোরে।'

'কই, আমাকে কিছু জানাননি তো।'

'তখন আপনার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না। চিঠি লেখালিখি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।'

একটু চুপ করে থেকে লারউড বললেন, 'কি হয়েছিল বিনোদের?'

'পরে বলব,' বলেই বিনায়কের দিকে ফিরলেন নারায়ণদাস শুক্লা, 'কি ওঁকে প্রণাম করলি না?'

লারউডের পা ছোঁয়ার জন্য ঝুঁকতেই বিনায়ককে দু-হাতে জড়িয়ে ধরলেন লারউড, 'গড ব্লেস ইউ।' একটু থেমে বললেন, 'আমি যখন ইণ্ডিয়া ছেড়ে চলে যাই তখন বিনোদের বিয়েই হয়নি। তার ছেলে এখন কত বড় হয়ে গেছে?'

নারায়ণদাস শুক্লা বললেন, 'সময়—'

লারউড হাসলেন, 'হ্যাঁ, সময়। হাতের ফাঁক দিয়ে অনেক সময় চলে গেছে।' ধীরে ধীরে বিনায়ককে বুকের ভেতর থেকে বার করে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিলেন লারউড। তার কাঁধে দুটি হাত রেখে সস্নেহে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী কর তুমি? স্টুডেন্ট?'

'দু' বছর আগে এম. এ. পাস করেছি। এখন একটা ডিগ্রি কলেজে লেকচারার।

'ফাইন। কী সাবজেক্ট তোমার?'

'ইকনমিক্স।'

'একসেলেন্ট। তোমার কাছ থেকে স্বাধীন ভারতের ইকনমিক প্যাটার্ন সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যাবে।'

এই সময় কানাডিয়ান ইঞ্জিনের গম্ভীর ভোঁ শোনা গেল। তারপরেই দেখা গেল, মেইল ট্রেনটা আস্তে আস্তে লম্বা সরীসৃপের মতো চলে যাচ্ছে।

নারায়ণদাস বললেন, অনেকক্ষণ আমরা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছি। চলুন, এবার যাওয়া যাক।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, চলুন—' বলে স্যুটকেশ আর হোল্ড-অলটা নেবার জন্য লারউড যেই হাত বাড়াতে যাবেন, তার আগেই সে দুটো টপ করে তুলে নিল বিনায়ক।

লারউড বিব্রত হয়ে বললেন, 'আরে আরে, এ কী করছ, আমাকে দাও—'

নারায়ণদাস বললেন, 'এগুলো ওকেই নিতে দিন।'

'দেখ দিকি, কী কাণ্ড—'

স্টেশনে এখন খুব ভিড়-টিড় নেই। এখানে ওখানে দু-চারজনের একেকটা থোকা চোখে পড়েছিল। মেইল ট্রেনটা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই থোকা ভেঙে সবাই চলে যাচ্ছে।

একটু পর নারায়ণদাসরা স্টেশন গেটের কাছে চলে এলেন। গেটের কাছে বা প্ল্যাটফর্মে কালো কোট পরা গেট কীপার কিংবা অন্যান্য কর্মচারীদের দেখা যাচ্ছিল। তাদের বেশির ভাগই যুবক। দু-একজন মধ্যবয়সী। সাতাশ বছর আগে এখানকার স্টেশন মাস্টার থেকে শুরু করে পয়েন্টসম্যান পর্যন্ত সবাইকে চিনতেন লারউড। এতকাল পর সেই সব চেনা মুখগুলোর একটিকেও খুঁজে পাওয়া গেল না। লারউড বললেন, 'রেলের সেই সব পুরনো লোক বোধহয় আর নেই, তাই না শুক্লাজী ?'

নারায়ণদাস বললেন, 'তারা কি আর থাকে! রিটায়ার-টিটায়ার করে কোথায় চলে গেছে।'

লারউড মজা করে বললেন, 'সময়।'

নারায়ণদাস সুর মিলিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ সময়—' বলে হাসলেন।

গেটে টিকেট জমা দিয়ে ওঁরা যখন বেরিয়ে আসছেন সেই সময় একটা বুড়ো মতো লোক, তামাটে রঙের চামড়া কুঁচকে জালি জালি চোখে পাতলা কাচের মতো ভারী গোল চশমা, মাথায় পাগড়ি, পরনে খাটো ধুতি আর হ্যাণ্ডলুমের ডোরা-কাটা হাফ শার্ট, পায়ে কাঁচা চামড়ার প্রকাণ্ড জুতো, কানে রুপোর মাকড়ি—দৌড়তে দৌড়তে লারউডের কাছে এলো। দু-হাত জোড় করে মাথা অনেকখানি ঝুঁকিয়ে অত্যন্ত সম্ভ্রমের ভঙ্গিতে বলল, 'নমস্তে বড়ে সাব—'

লারউড লোকটাকে চিনতে পারলেন না। বললেন, 'নমস্তে। কিন্তু তোমাকে তো আমি ঠিক—'

লোকটা বলল, 'হুজৌর আমি ধনেরিলাল। হুজৌর মা-বাপ, আপনি মেহেরবানি করে আমাকে টিশনের 'চায়' দুকানের লাইসিন দিয়েছিলেন তাই বালবাচ্চা নিয়ে বেঁচে আছি। মনে পড়ছে বড়ে সাব?'

এবার মনে পড়ে গেল লারউডের। তিশ-বত্রিশ বছর আগে সেই বৃটিশ আমলে এই ধনেরিলাল ছিল একজন দাগী চোর। বছরের সাত-আটটা মাস সে জেলে জেলে থাকত। বাকী সময়টা বাইরে। ধনেরি-লাল ছিল এমনই মার্কামারা যে অন্য কেউ চুরি করলেও লোকে তাকে ধরেই বেদম ঠ্যাঙাত। তারপর পুলিসের হাতে তুলে দিত। চুরির ব্যাপারে কারো সম্পর্কেই তার কোন রকম পক্ষপাতিত্ব ছিল না। ধনেরিলালের হাতের কাজ ছিল এমনই সূক্ষ্ম আর সুচারু যাতে দোকানদার, জমিদার, থানার দারোগা, কনস্টেবল থেকে শুরু করে মোক্তার মুহুরি এবং জজ-সাহেবরা পর্যন্ত পার পায়নি। কিন্তু একবার লারউডের মতো জবরদস্ত ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়িতে হানা দিয়ে তাঁর সোনা-বাঁধানো চুরুট খাওয়ার পাইপ আর নতুন একজোড়া চপ্পল নিয়ে সরে পড়বার সময় ধরা পড়ে যায়। বাড়ির চাকর-বাকর পাঙ্খা-বরদার আর মালীরা তাকে মারতে মারতে কপাল মুখ ফাটিয়ে লারউডের কাছে নিয়ে আসে। লারউড চাকর-বাকরদের থামিয়ে তাদের দিয়ে তুলো আইডিন-টাইডিন আনিয়ে ধনেরিলালের কপাল আর মুখ ব্যাণ্ডেজ করিয়ে দিয়েছিলেন।

সেটা ছুটির দিন, লাঞ্চের সময়। সবাইকে, এমন কি ধনেরিলালকে পর্যন্ত অবাক করে দিয়ে লারউড তাকে লাঞ্চের টেবিলে নিয়ে খেতে বসিয়েছিলেন। বড় সাবের সঙ্গে এক টেবলে বসে কিছুতেই খাবে না ধনেরিলাল। লারউডকে তাই জোরজার করতে হয়েছিল। পাঙ্খা-বরদাররা দড়ি দিয়ে টেনে টেনে হাওয়া করছিল। উর্দিপরা বেয়ারারা দামী প্লেটে নানা ধরনের সুখাদ্য দিয়ে যাচ্ছিল। খেতে খেতে টেবলের এক-প্রান্ত থেকে লারউড জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'চুরি করিস কেন?' টেবলের আর এক প্রান্তে ভয়ে ঘাড় গুঁজে সিঁটিয়ে বসেছিল ধনেরিলাল। মাঝে মাঝে লারউড প্রচণ্ড ধমকে উঠলে কাঁপা কাঁপা হাত বাড়িয়ে প্লেট থেকে কিছু তুলে নিয়ে মুখে পুরছিল সে। খুব সরল এবং আন্তরিক গলায় বলেছে, 'চুরি ছাড়া আর কোন কাজ যে সে জানে না। লারউড বলে-ছিলেন, 'তুই জানিস কাজটা খুব বুরা (খারাপ)?' ধনেরিলাল বলেছিল, 'লোকে বলে। আমি ঠিক বুঝতে পারি না।' লারউড বলে-ছিলেন, 'জিন্দগীভর তো চুরি করে যাচ্ছিস। এক কিসিমের কাজ করতে একঘেয়ে লাগে না? এবার অন্য কিছু করে দেখ না। লোকের হাতে মার খেয়ে খেয়ে হাড্ডি তো ঢিলে হয়ে গেছে; জেলের লাপসি খেয়ে অরুচি ধরে না? আর সবার মতো মার না খেয়ে জেল না খেটে তোর বাঁচতে ইচ্ছে করে না?' ধনেরিলাল বলেছিল, 'মাঝে মাঝে ভদ্দরলোক হবার জন্যে লাক টিরাই (লাক ট্রাই) করতে ইচ্ছে হয়। লেকেন আমার মতো চোর চুরি ছাড়া আর কী কাম করবে? আর বিশোয়াস করে কে-ই-বা কাম দেবে?' লারউড বলেছিলেন, 'সেটা আমি দেখছি। তোকে একটা কাজ আমি যোগাড় করে দেব। যদি ভালো না লাগে আবার তোর পুরনো চুরির কাজেই ফিরে যাস।' দিনকয়েক বাদে নিজের দায়িত্বে রেল কোম্পানির কাছ থেকে ধনেরিলালের জন্য স্টেশনে টী স্টলের একটা লাইসেন্স আদায় করে দিয়েছিলেন।

ধনেরিলালের কাঁধে একটা হাত রেখে লারউড বললেন, 'চিনেছি। ভালো আছ তো?'

ধনেরিলাল বলল, 'আপকা কিরপা (কৃপা) মা বাপ।'

'কি কর আজকাল ?'

'আপনি 'চায়' দুকানের লাইসিন দিয়েছিলেন। সেটা চালাচ্ছি।'

'বাড়ির খবর সব ভালো ?'

'জী হুজৌর।'

'ক'টি ছেলেমেয়ে ?'

'দুই লেড়কা, এক লেড়কী। লেড়কীর শাদি দিয়েছি। জামাই সরকারী নোকরি করে। বড়া লেড়কা আমার সাথে চায় দুকান দ্যাখে। ছোট লেড়কা এম.এ. পড়ে। সব হুজৌরের কিরপা।'

শুনতে শুনতে খুব ভালো লাগছিল লারউডের। ফার্স্ট জেনারেশন যেখানে চোর সেখানে তারই সেকেণ্ড জেনারেশন এম.এ. পড়ছে। খবরটা চমকে দেবার মতো। মানুষ নিয়ে মধ্যপ্রদেশের এই ডিস্ট্রিক্টে কিছু কিছু এক্সপেরিমেণ্ট করেছিলেন লারউড। অন্তত একটা এক্স-পেরিমেণ্ট ব্যর্থ হয়নি। তাঁর সমস্ত বুক অদ্ভুত সুখের অনুভূতিতে ভরে যাচ্ছিল। বললেন, 'তোমার খবর শুনে বড় ভালো লাগল। একদিন তোমার বাড়ি যাব।'

ধনেরিলালের চোখমুখ দেখে মনে হল, হাতে চাঁদ পেয়েছে। বলল, 'আপকা বহোৎ বহোৎ কিরপা। কবে আসবেন হুজৌর ?'

'যাব একদিন। আমি তো এখন আছি—'

'এখানে কোথায় আপনার সাথ দেখা করব ?'

'শুক্লাজীর সঙ্গে দেখা কোরো। উনি বলে দেবেন।'

'জী—'

স্টেশনের গায়েই নিচে নামার অনেকগুলো সিঁড়ি। সিঁড়ির নিচে রাস্তা। রাস্তার একধারে অনেকগুলো ঝাঁকড়া মাথা রেন-ট্রি। গাছ-গুলোর ছায়ায় অগুনতি টাঙ্গা দাঁড়িয়ে আছে।

২

স্টেশন থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে লারউডরা নিচে নামতে লাগলেন। সাতাশ বছর আগে সামনের রাস্তাটাকে খুব সরু দেখে গিয়েছিলেন। এখন সেটা দশগুণ চওড়া হয়ে গেছে। তার ওধারে জমজমাট দোকানপাট। স্টেশনারি দোকান, খাবারের দোকান, ঠাণ্ডা লস্যির দোকান, পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকান, খালসা হোটেল, রেস্তোরাঁ ইত্যাদি। এই সকালবেলাতেই রাস্তায় প্রচুর লোকজন চোখে পড়ছে।

লারউডদের দেখে টাঙ্গাওলারা জোরসে চেঁচাতে লাগল, 'আইয়ে সাব—আইয়ে হুজৌর—'

ওঁরা নিচে নেমে এলেন। বিনায়ক একটা টাঙ্গাওলার সঙ্গে কথা বলে মালপত্র তুলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ ডানদিকের শেষ মাথা থেকে অন্য একটা মধ্যবয়সী টাঙ্গাওলা দৌড়ে এলো। হাট্টাকাট্টা চেহারা লোকটার, পাথরের চাংড়ার মতো বুক, ছ ফুটের মতো লম্বা দেহ, সারা গায়ে চওড়া চওড়া মজবুত হাড়। মাথার জট পাকানো কাঁচাপাকা চুল। সে এসেই লারউডের পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। দু'হাতে পা দুটো জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ মাথা ঠুকল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'হুজৌর, আমি ভোলা, আপকা নৌকর—'

ভোলাকে চিনতে পেরেছিলেন লারউড। তাঁর আরেক এক্সপেরিমেন্ট। তাঁর আমলে এই ভোলা নামের লোকটা ছিল বণ্ডেড লেবারার। তার ওপর অচ্ছুৎ। এখান থেকে তিরিশ মাইল দূরের এক দেহাতে এক রাজপুত ক্ষত্রিয় জমিদারের কাছে পেটভাতায় তারা স্বামী-স্ত্রী বছরের পর বছর বেগার খাটত। গরমকালের এক দুপুরে তেষ্টায় যখন বুক ফেটে যাচ্ছে তখন জমিদারের কুয়ো থেকে জল তুলে খেয়েছিল ভোলা আর তার জেনানা কবুতরী। সেই নাইন্টিন ফরটিটুতে জল-অচল অচ্ছুৎদের পক্ষে এটা ছিল মারাত্মক অপরাধ।

কুয়ো থেকে জল তুলে খাবার সময় রাজপুত জমিদার বিন্ধ্যাচলী সিং-এর লোকজনেরা ভোলা আর কবুতরীকে দেখে ফেলেছিল। তক্ষুনি তারা দুজনকে দুটো গাছের সঙ্গে বেঁধে বিন্ধ্যাচলী সিংকে খবর দেয়।

বিন্ধ্যাচলী লোকটা শুদ্ধ ভাষায় যাকে নৃশংস বলে, সেই টাইপের। বিশাল চেহারা তার, প্রকাণ্ড মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, গালের মাঝামাঝি পর্যন্ত চওড়া জুলপি, চৌকো মাংসল মুখ। চোখ দুটো টকটকে লাল এবং হিংস্র। সারাদিন কান্ট্রি লিকার খেত সে।

সর্বক্ষণ বিন্ধ্যাচলীর পরনে চুস্ত, লক্ষ্ণৌয়ের কলিদার পাঞ্জাবি আর জরি-বসানো বাঘের চামড়ার নাগরা। হাতে থাকত একটা কাঁটা-বসানো হান্টার। কথায় কথায় চাবুক চালাত সে। কত যে খুন করেছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। ভারতবর্ষের ফিউডাল এজের একজন নিখুঁত প্রতিনিধি ছিল বিন্ধ্যাচলী সিং।

ধমতোরি শহর থেকে তিরিশ-চল্লিশ মাইলের মধ্যে যত দেহাত-টেহাত রয়েছে তার সমস্ত জমিজমা ছিল বিন্ধ্যাচলীর কব্জায়। দশ-বারোটা গ্রামের সব সমর্থ পুরুষ আর মেয়েমানুষ ছিল তার জমিতে বণ্ডেড লেবারার। পেট-ভাতায় তারা মুখ বুজে বছরের পর বছর কাজ করত। বিন্ধ্যাচলী নিজে তো বটেই, তস্য বাবা, তস্য বাবা, তস্য বাবা, সবাই বংশানুক্রমে জমিদার। বংশানুক্রমে চারদিকের গ্রামের লোকেদের ওদের জমিতে এ রকম বেগার দিতে হত।

যাই হোক, বিন্ধ্যাচলী এসেই হাতের কাঁটা-বসানো চাবুক চালাতে শুরু করেছিল। মার খেয়ে খেয়ে ভোলা আর তার জেনানার শরীর রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিল। প্রাণফাটানো চিৎকার করতে করতে যখন স্বামী-স্ত্রী অজ্ঞান হয়ে গেছে সেই সময় আরো দূরের দেহাত থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছিলেন লারউড। তাঁর সঙ্গে স্থানীয় থানার সাব-ইন্সপেক্টর। তাঁরাও তাঁর পিছন পিছন ঘোড়ায় করে আসছিল। সে সময় মাঝে মাঝেই লারউড দু-একটি পুলিসের লোক সঙ্গে নিয়ে দেহাতে দেহাতে ঘুরে যেতেন।

দূর থেকে বিন্ধ্যাচলীর মার দেখে লম্বা লম্বা গ্যালপে কাছে এসেছিলেন লারউড এবং তক্ষুনি তাকে অ্যারেস্ট করার হুকুম দিয়েছিলেন। লোকটার নানা কুকীর্তির খবর তিনি আগে থেকেই পাচ্ছিলেন কিন্তু হাতে-নাতে তাকে ধরা যাচ্ছিল না। এই সুযোগে বিন্ধ্যাচলীকে তিনি ডিস্ট্রিক্ট টাউনে নিয়ে এলেন। লোকটা তাকে ছেড়ে দেবার জন্য প্রথমে কয়েক হাজার টাকা ঘুষ দিতে চেয়েছিল। লারউড আরো ক্ষেপে গিয়েছিলেন।

সেই ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষের মাটিতে যখন ফিউডাল সিস্টেম জাঁকিয়ে বসে আছে তখন একজন জমিদারকে এভাবে চালান দেওয়া সহজ ব্যাপার ছিল না। অনেকেই, এমন কি প্রভিন্সিয়াল সেক্রেটারিয়েট থেকে বিন্ধ্যাচলী সিং সম্পর্কে লারউডকে আর একটু নরম হতে বলেছিলেন। কেননা এই জমিদার শ্রেণীর লোকেরা ছিল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার প্রকৃত বন্ধু।

লারউড কারো কথাই শোনেননি। তাঁর কাছে রুল অফ ল ছিল সবার উপরে। তাঁর মতে মানুষের যদি নিরাপত্তা না থাকে সেই স্টেট থাকার দরকার কী?

বিচারে তিন মাস জেল হয়েছিল বিন্ধ্যাচলীর। আর ভোলা এবং তার স্ত্রীর শারীরিক ক্ষতিপূরণের জন্য পাঁচশো টাকা ফাইন।

বিন্ধ্যাচলী জেলে চলে গিয়েছিল। ভোলা কিন্তু দেহাতে ফিরে যায়নি। সে জানিয়েছিল, বিন্ধ্যাচলীর জেলের মেয়াদ একদিন শেষ হবে। তখন যদি সে তাকে হাতে পায় জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে। কাজেই লারউড জরিমানার টাকায় ভোলাকে একটা ঘোড়া আর টাঙ্গা গাড়ি কিনে দিয়েছিলেন এবং তার থাকার জন্য সরকারী হাসপাতালের পিছন দিকে নিজের খরচায় ছোট্ট একটু জমি কিনে ঘর তুলে দিয়েছিলেন।

সামান্য একটা ঘটনা এই ব্যাপারে মনে পড়ছে। বিন্ধ্যাচলীর জেল হবার তিন মাস পর হিন্দীতে লেখা একটা বেনামী চিঠি পেয়েছিলেন লারউড। 'শালে হারামজাদকে বাচ্চে, জরুর বদলা লেঙ্গে।

তেরে বাপ।'

চিঠিটা পড়ে খুব একচোট হেসেছিলেন লারউড। এটা কার কীর্তি বুঝতে অসুবিধা হয়নি। কিন্তু বেনামী পত্রদাতা কোন দিনই বদলাট আর নিতে পারেনি। তারপর তো ভারত স্বাধীন হয়ে গেল। তিনিও লণ্ডনে ফিরে গেলেন।

লারউড বললেন, 'ভালো আছিস ভোলা?'

ভোলা বলল, 'আপকা কিরপা মা-বাপ।'

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভোলার বাড়ির অনেক খবর নিলেন লারউড। ভোলারা তাঁর দেওয়া সেই বাড়িতেই আছে। তার দুই ছেলে তিন মেয়ে। মেয়েদের শাদি হয়ে গেছে। ছেলেরা এখন পড়ি-লিখি আদমী। একজন ম্যাট্রিক পাস করে রেলে চাকরি করে। বিলাসপুরে থাকে। হরিজনদের জন্যে গরমিণ্ট চাকরির যে কোটা ঠিক করে দিয়েছে তাতেই চাকরিটা হয়েছে। ছোট ছেলে কলেজে পড়ে। বিন্ধ্যাচলী সিংয়ের জরিমানার টাকায় যে টাঙ্গা আর ঘোড়া কেনা হয়েছিল সেই ঘোড়াটা মরে গেছে, টাঙ্গাগাড়িটাও নষ্ট হয়ে গেছে। নতুন ঘোড়া আর নতুন টাঙ্গা কিনেছে ভোলা। ইত্যাদি।

এক রকম জোরজার করে নিজের গাড়িতে লারউডদের তুলল ভোলা। তুলেই ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

অচ্ছুৎ ভোলার এক ছেলে সরকারি চাকরি পেয়েছে। আরেক ছেলে ধনেরিলালের ছেলের মতো কলেজে পড়ছে। শুনতে শুনতে খুব ভালো লাগছিল লারউডের। ইণ্ডিপেণ্ডেন্সের পর ভারতবর্ষের তা হলে যথেষ্টই উন্নতি হয়েছে। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, বিন্ধ্যাচলী সিংএর খবর কী রে?'

ভোলা বলল, 'এমলে হবার জন্যে কোশিস করছে হুজৌর।'

'এমলে কী?'

নারায়ণদাস আর লারউড টাঙ্গার পিছন দিকের সীটে পাশাপাশি বসেছিলেন। আর সামনে ভোলার পাশে বসেছে বিনায়ক।

নারায়ণদাস এবার বললেন, 'এমলে মানে এম.এল.এ.।' তারপর এম.এল.এ. ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন।

লারউড খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'বিন্ধ্যাচলীর মতো একটা লোক পিপল্‌স রিপ্রেজেণ্টেটিভ হয়ে লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে যেতে চাইছে!'

'হ্যাঁ।' আস্তে মাথা নাড়লেন নারায়ণদাস।

লারউড বললেন, 'আমি যতদূর জানি আপনাদের দেশের ফ্রীডম স্ট্রাগলের সময় লোকটা কিছুই করেনি। সেই লোক জনসাধারণের প্রতিনিধি হয় কী করে?'

নারায়ণদাস সামান্য হাসলেন, 'স্বাধীনতার পব এক ক্লাসের নতুন দেশসেবক তৈরি হয়েছে। আপনি এদের দেখে যাননি। বিন্ধ্যাচলী তাদের একজন।'

লারউড মজা কবে একটু হাসলেন, 'আই সী! এই পোস্ট-ইণ্ডি-পেণ্ডেন্স প্যাট্রিয়টটিকে একটু দেখতে ইচ্ছে করছে।'

'এসেছেন যখন, তখন নিশ্চয়ই দেখা হয়ে যাবে।'

ওঁদের কথাবার্তার মধ্যেই ভোলার টাঙ্গা স্টেশনের রাস্তা পিছনে ফেলে ডানদিকে ঘুরে অন্য একটা রাস্তায় এসে পড়ল। এ রাস্তাটাও লারউডের চেনা। তবে এটাকেও স্টেশনের রাস্তাটার মতো চওড়া করা হয়েছে।

সাতাশ বছর আগে ত্ব'ধারে বাড়িঘর ছিল খুবই কম। ফাঁকা জায়গাই বেশি। তখন লোকজনও তেমন চোখে পড়ত না।

টাঙ্গা থেকে লারউড দেখতে লাগলেন, ত্ব'পাশে কোথাও ইঞ্চি-খানেক ফাঁকা জায়গা পড়ে নেই। চারদিকে ঘিঞ্জি বাড়িঘর। বেশির ভাগই টালির আর টিনের। মাঝে মাঝে হঠাৎ চমকে দেবার মতো ত্ব-একটা মডার্ন আর্কিটেকচারের ঝকমকে দোতলা কি তেতলা। এই সকালবেলাতেই রাস্তায় প্রচুর মানুষজন দেখা যাচ্ছে।

এদিকে সূর্যটা আকাশের খাড়া পাড় বেয়ে বেয়ে অনেকটা ওপরে

নারায়...

করে নিন। সাতাশ বছর আ...

ভোলার টাঙ্গার ঘোড়াটা যেমন তেজ...
ঘাড়ের লম্বা লম্বা বাদামী রোঁয়া ফুলিয়ে পাথুরে রাস্তায় খট...
তুলে সেটা দৌড়চ্ছিল।

নারায়ণদাসের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ লারউডের চোখ গিয়ে পড়ল বিনায়কের ওপর। দেখলেন, একদৃষ্টে তাঁকেই দেখছে বিনায়ক। শুধু এখনই না, সেই স্টেশন থেকেই ছেলেটা এইভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। লারউড সস্নেহে একটু হেসে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী দেখছ?'

বিনায়ক বলল, 'আপনাকে। আপনার কথা দাদাজীর কাছে এত শুনেছি যে কী বলব!'

লারউড মজা করে হাসলেন, 'উঁহু---'

'উঁহু মানে—' বিনায়ক একটু অবাকই হল।

লারউড বিনায়কের দিকে অনেকখানি ঝুঁকে তার নাকে আদরের ভঙ্গিতে একটা টোকা দিলেন, 'আমাকে না। আসলে ব্রিটিশ কলোনিয়াল মাস্টাররা কেমন ছিল, তাই দেখছিলে। ঠিক বলেছি?'

বিনায়ক প্রথমটা হকচকিয়ে গেল। তারপর হেসে ফেলল। হাসতে

... আছে ?'

... নেই।' লারউড বলতে লাগলেন, 'ক্রিমিনো-

...রা বলে সিনাররা ঘুরে ঘুরে একবার না একবার তার প্লেস অফ সিনে চলে আসে। লাইফের লম্বা দৌড় তো শেষ করে আনলাম। জীবনের অনেকগুলো বছর এই ধমতোরি ডিস্ট্রিক্টে অগুনতি পাপ করে গেছি। আর ক'দিনই বা বাঁচব! ভাবলাম, মৃত্যুর আগে পাপকর্মের জায়গাটা একবার ঘুরে আসি।

নারায়ণদাস এই সময় প্রতিবাদের ভঙ্গিতে বলে উঠলেন, 'ওঁর কথা বিশ্বাস করিস না বিনয়। কোন অন্যায় কোন পাপ উনি করেননি। ওঁর মতো হিউম্যানিটারিয়ান ব্রিটিশার আমার লাইফে আর কখনও দেখিনি।'

লারউড হাসছিলেন। কৌতুকের ভঙ্গিতে এবার বিনায়ককে বললেন, 'তোমার দাদাজী যে ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট দিলেন সেটা কিন্তু ওঁর পক্ষে দেওয়া ঠিক না। দাদাজীকে জিজ্ঞেস কর, আমি ওঁকে নন-কোঅপারেশন মুভমেণ্টের সময় দু'বছর জেল দিয়েছিলাম কিনা? লোক আমি ভালো নই।'

নারায়ণদাস নাতিকে বললেন, 'নিশ্চয়ই জেল দিয়েছিলেন। সেটা

দেশের তখনকার আইন অনুযায়ী তাঁকে দিতে হয়েছিল। তুই ওঁকে জিজ্ঞেস করে ছাখ, আমি যখন জেলে তখন আমার সংসার চালিয়েছিল কে? তোর বাবা আর দাদীকে কে দু-বেলা এসে দেখে যেত?'

বিব্রতভাবে হাসতে লাগলেন লারউড, 'কত আজেবাজে কথা যে আপনার মনে থাকে শুক্লাজী!'

বিনায়ক তাকিয়েই ছিল। দুই বৃদ্ধের আশ্চর্য সুন্দর খুনসুটি তার ভীষণ ভালো লাগছিল।

এদিকে রোদ ক্রমশ চড়ে যাচ্ছে। রাস্তায় লোকজনের ভিড়ও বাড়ছে। প্রায় সবই অচেনা নতুন মুখ।

রাস্তায় যত লোক যাতায়াত করছে, নারায়ণদাসদের সঙ্গে লারউডকে দেখে তারা অবাক হয়ে যাচ্ছিল। এই ছোট্ট শহরে এভাবে টাঙ্গায় করে কোন ধবধবে সাদা চামড়ার সাহেবকে তারা যেতে ছাখেনি। ভিড়ের ভেতর থেকে মাঝেমধ্যে দু-একজন বেশি বয়সের লোক সম্ভ্রমের ভঙ্গিতে লারউডের উদ্দেশে বলছিল, 'নমস্তে বড় সাব' অথবা 'সেলাম হুজৌর' কিংবা 'নমস্তে বড়ে সরকার—' ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঐ লোকগুলো নিশ্চয়ই লারউডকে চিনতে পেরেছে। এত কাল বাদে লারউড কিন্তু তাদের চিনতে পারছিলেন না। তবু ভদ্রতা এবং সৌজন্যের খাতিরে তাদের উদ্দেশে হাতজোড় করে বলছিলেন, 'নমস্তে' বা 'সেলাম' আর তারই মধ্যে বিনায়ক বা নারায়ণদাসের সঙ্গে কথা বলছিলেন।

ভোলার টাঙ্গা এর ভেতর অনেক রাস্তা আর অলিগলি পেরিয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ কী মনে পড়তে লারউড বললেন, 'একটা কথা কিন্তু জানতে পারিনি—'

নারায়ণদাস জিজ্ঞেস করলেন, 'কী?'

'আমার থাকার কোথায় ব্যবস্থা করেছেন?'

'ওটা বলতে ভুলে গেছি। আমাদের সবার ইচ্ছা আপনি আমাদের কাছে থাকুন। তাই আর হোটেলে ঘর বুক করিনি।'

'আপনাদের কাছে থাকতে পারাটা খুবই আনন্দের ব্যাপার সন্দেহ নেই। নাথিং লাইক ইট।'

'অবশ্য গরীবের বাড়িতে আপনার খুবই অসুবিধা হবে।'

লারউড ব্যথিত হলেন। নারায়ণদাসের একটা হাত ধরে গভীর আবেগের গলায় বললেন, 'এ আপনি কী বলছেন শুক্লাজী! আপনি আমার বন্ধু। আপনার বাড়ি আমার বাড়ি বলেই মনে করি।'

বিব্রতভাবে নারায়ণদাস বললেন, 'না বুঝে দুঃখ দিয়েছি; কিছু মনে করবেন না স্যার।' সেই ব্রিটিশ আমলে লারউডকে স্যার বলতেন নারায়ণদাস। সেই অভ্যাসটা এখনও বজায় আছে তাঁর।

কখনও নারায়ণদাসের সঙ্গে কখনও বা বিনায়কের সঙ্গে এলোমেলো কথা বলছিলেন লারউড। টাঙ্গাটা ছুটছে। ছুটেই যাচ্ছে। পাথুরে রাস্তা থেকে ঘোড়ার খুরের সেই ধ্বনি অনবরত উঠে আসছে, খট খট খটাখট—

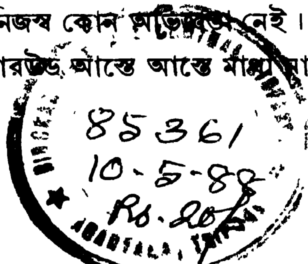
এক সময় রগড়ের গলায় লারউড বিনায়ককে ডাকলেন, 'এই যে মাস্টারজী—'

বিনায়ক কলেজের লেকচারার। সেই জন্যই মাস্টারজী বলা। সে একটু হেসে তাকাল, 'বলুন—'

'তুমি তো ইকনমিক্স পড়াও। তোমাদের দেশের ইকনমিক্স প্যাটার্নটা এখন কেমন? ইণ্ডিয়া যখন ব্রিটিশ কলোনি ছিল তখনকার চাইতে সাধারণ মানুষের অবস্থা আশা করি অনেক ভালো হয়েছে?'

বিনায়ক জানালো ইণ্ডিয়া যখন ব্রিটিশ কলোনি ছিল তখন তার জন্মই হয়নি। সে জন্মেছে স্বাধীন ভারতে। তার পক্ষে দুই সময়ের কমপ্যারেটিভ স্টাডি করা মুশকিল। অবশ্য পুরনো রেকর্ড বা স্ট্যাটিস-টিক্স ঘাঁটলে পরাধীন ভারতের ইকনমিক্স প্যাটার্নের মোটামুটি একটা চেহারা ধরা যায়, কিন্তু সেই সময় বা তখনকার মানুষের অবস্থা সম্বন্ধে তার নিজস্ব কোন অভিজ্ঞতা নেই। নেহাতই বই-টই পড়ে জানা।

লারউড আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন, 'তা ঠিক।'



বিনায়ক বলল, 'আপনি বরং দুই সময়ের তফাতটা বলতে পারবেন। পরাধীন ভারত আপনি দেখে গেছেন। আবার এত দিন পর স্বাধীন ভারতে এলেন। আপনার পক্ষেই ইমপার্সিয়ালি দুই সময়ের ইণ্ডিয়াকে স্টাডি করা সম্ভব।'

লারউড এবার নারায়ণদাসের দিকে ফিরলেন। বললেন, 'শুক্লাজীও তো স্বাধীন আর পরাধীন দুই ভারতকে দেখেছেন। আপনি কি বলেন?'

নারায়ণদাস কী বলতে যাচ্ছিলেন তার আগেই একটা প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিয়ে টাঙ্গাটা থেমে গেল। পরক্ষণেই ভোলার বিরক্ত চাপা গলার গজগজানি ভেসে এলো, 'শালে আজ ভি আ গায়া—'

চমকে সামনের দিকে তাকালেন লারউড। দেখলেন কয়েক গজ দূরে পুরনো মডেলের বিশাল একটা ফোর্ড গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িটার সামনে এবং পিছনে অনেকগুলো টাঙ্গা আর সাইকেল রিক্শা থেমে আছে। রিকশাগুলো সমানে হর্ন দিচ্ছিল আর টাঙ্গাওয়ালারা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছিল, 'গাড়ি হটাইয়ে, গাড়ি হটাইয়ে —' গাড়িটা আটকে রাখার জন্য কেউ এধার থেকে ওধারে যেতে পারছিল না। টাঙ্গা আর সাইকেল রিক্শা ছাড়া বেশ কিছু লোকজনও থোকায় থোকায় ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে।

লারউড এই জায়গাটা চিনতে পারলেন। ব্রিটিশ আমলে এই রাস্তাটার বাঁ দিকে ছিল বাঈজী পাড়া। নামেই বাঈজী, আসলে এটা একটা ব্রথেল। ইমমরাল ট্রাফিকিং-এর আড়ত। মেয়েমানুষ নিয়ে অনেক খুনখারাপি হয়ে গেছে এখানে। মধ্যপ্রদেশের এই জেলার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে আসার পর এই কুখ্যাত রেড লাইট এরীয়াটাকে ঢিট করে রেখেছিলেন লারউড।

সাইকেল রিক্শা এবং টাঙ্গাওয়ালারা ক্রমশ অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিল আর সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছিল, 'গাড়ি হটাইয়ে, গাড়ি হটাইয়ে—' কিন্তু গাড়ির ড্রাইভার-ট্রাইভার কারো টিকিটিও দেখা যাচ্ছিল না।

লারউড নারায়ণদাসকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এক সময় বাঁদিকটায় বাঈজীদের পাড়া ছিল না ?'

নারায়ণদাস বললেন, 'হ্যাঁ। এখনও তাই আছে। আপনার আমলে সব ব্যাপারটা কন্‌ট্রোলে ছিল। এখন একেবারে নুইসেন্স হয়ে উঠেছে। দিন রাত কোন সময় এখান দিয়ে চলা যায় না। শটকার্ট হয় বলে টাঙ্গাওলারা এদিক দিয়ে যায়।'

লারউড বললেন, 'আই সি—' একটু থেকে বললেন, 'রাস্তা আটকে কে ঐ গাড়িটাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে ?'

নারায়ণদাস উত্তর দেবার আগেই ঘাড় ফিরিয়ে ভোলা বলল, 'ওটা বুধোয়ারী সিং-এর গাড়ি হুজৌর। যেদিন হারামজাদ বাঈজীপাড়ায় আসে সেদিনই গাড়িটা ঐভাবে রাস্তায় ফেলে রাখে। যেন সড়কটা ওর বাপের জমিদারি।'

লারউড বললেন, 'এভাবে রাস্তা আটকে রাখা তো বে-আইনি।'

ভোলা গজর গজর করতে লাগল, 'আইনটা আর মানছে কে ? হিম্মৎ যার মুল্লুক তার।'

লারউড নারায়ণদাসকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাঈজী পাড়ায় ফুর্তি করতে এসে রাস্তায় গাড়ি রেখে লোকের অসুবিধা করার মতো এত সাহস কার ? আমি কি মহাপুরুষটিকে চিনি ? বুধোয়ারি সিং—কই, এই নামটা মনে পড়ছে না ?'

সামনের সীট থেকে ভোলা বলল, 'ওকে আপনি চেনেন না হুজৌর। তবে ওর বাপকে জরুর চেনেন।'

'কে ওর বাপ ?' জানার জন্য লারউড রীতিমত কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।

'হুজৌর আপনি তাকে তিন মাহিনা কয়েদ আর পাঁচশো রুপেয়া জুরমানা করেছিলেন।' ভোলা সোজাসুজি নামটা বলল না, রহস্য-কাহিনীর গোয়েন্দাদের মতো সামান্য একটু ইঙ্গিত দিয়ে গেল।

আর তাতেই বিদ্যুৎ চমকের মতো নামটা মনে পড়ে গেল লারউডের।

তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, 'বিন্ধ্যাচলী সিং-এর কথা বলছিস ?'

'জী হুজৌর—'

'বুধোয়ারি তা হলে বিন্ধ্যাচলীর ছেলে ? বাপকা বেটা দেখছি।' বলতে বলতে নারায়ণদাসের দিকে ফিরলেন, 'বাপের একটা গুণ অন্তত ছেলে পেয়েছে, দেখছি। মানে এই ওম্যানাইজিং।' একটু থেমে বললেন, 'হেরেডিটারি ট্রান্সমিশন—'

নারায়ণদাস বললেন, 'শুনেছি ছেলেটা জঘন্য টাইপের, অত্যন্ত বদ—'

এদিকে ফোর্ড গাড়ির সামনে এবং পিছনে সাইকেল-রিক্‌শা আর টাঙ্গার লাইন দ্রুত লম্বা হয়ে যাচ্ছিল। চারপাশে লোকজনের ভিড়ও বেড়ে যাচ্ছে।

নারায়ণদাস ভোলাকে বললেন, গাড়ি ঘুরিয়ে অন্য রাস্তা দিয়ে যেতে। ভোলা জানালো, পিছনে কম করে শ-খানেক টাঙ্গা-ফাঙ্গা দাঁড়িয়ে গেছে। গাড়ি ঘুরিয়ে অন্য রাস্তায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব না।

সবার উত্তেজনা আর অসহিষ্ণুতা যখন চরমে পৌঁছেছে সেই সময় লারউড প্রায় চেঁচিয়েই উঠলেন, 'হোয়াট্‌স দিস ! এই অডাসিটি সহ্য করা যায় না।' বলতে বলতে লাফ দিয়ে টাঙ্গা থেকে নেমে পড়লেন। তাঁর রক্তের মধ্যে বহুকাল আগের এক দুর্ধর্ষ জবরদস্ত ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট যেন জেগে উঠেছে।

নারায়ণদাসও সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়েছেন। উদ্বিগ্ন মুখে তিনি বললেন, 'কোথায় যাচ্ছেন স্যর ?'

'বাঈজী পাড়ার ভেতরে। বজ্জাতটাকে কান ধরে এনে রাস্তা ক্লিয়ার করাতে হবে তো।'

নারায়ণদাস বললেন, 'ছেলেটা খুবই বাজে ধরনের। ওর সঙ্গে কথা বলতে গেলে আপনার সম্মান থাকবে না। তা ছাড়া ঐ খারাপ পাড়ায় আপনার যাওয়া ঠিক না।'

লারউড খানিকটা উত্তেজিত ভাবেই এবার বললেন, 'তাই বলে

রাসকেলটা না আসা পর্যন্ত ঘণ্টার পর ঘণ্টা সবাই এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে। ভোলা বলছিল, যেদিন বুধোয়ারি এ পাড়ায় আসে সেদিনই ঐভাবে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাস্তা অবস্ট্রাকশন করে রাখে। এর একটা বিহিত হওয়া দরকার।'

নারায়ণদাস বোঝাতে চাইলেন, লারউড এখন এ দেশের কেউ নন। তিনি একজন ব্রিটিশ ন্যাশনাল ; আপাতত এ দেশের অতিথি। তাঁর পক্ষে এখানকার কোন ব্যাপারে হাত দিতে যাওয়া ঠিক না।

লারউড এবার রেগেই গেলেন। বললেন, 'আমি ফরেনার হই আর যা-ই হই, রুল অফ ল বলে তো একটা কথা আছে। ন্যায়-অন্যায় শব্দ দুটো পৃথিবীর কোন দেশ থেকেই এখনও উঠে যায়নি। যে কোন মানুষ যে কোন দেশে গিয়ে বে-আইনি কাজের প্রতিবাদ করতে পারে।' বলতে বলতে রাস্তার ধারের কালভার্ট পেরিয়ে বাঈজী পাড়ার দিকে হাঁটতে লাগলেন।

ব্যাপারটা খুবই অস্বস্তিকর। একজন সত্যিকারের তেজী, সৎ, আইনের প্রতি অনুগত মানুষ হিসাবে লারউড যা বলেছেন বা করতে যাচ্ছেন, সবই সমর্থনযোগ্য। কিন্তু হাজার হোক, তিনি একজন বিদেশী নাগরিক ; মাত্র কয়েক দিনের ভিসা নিয়ে এদেশে এসেছেন। ভারতবর্ষের সঙ্গে এককালে তাঁর যে যোগাযোগই থাক, এখন তিনি এদেশের কেউ নন। বুধোয়ারি যে টাইপের লোক তাতে বিশ্রী অবাঞ্ছনীয় কিছু যদি ঘটে যায় সেটা নারায়ণদাসের পক্ষে গভীর দুঃখ এবং লজ্জার কারণ হয়ে উঠবে। কেননা লারউড তাঁরই অতিথি এবং বন্ধু।

রুদ্ধশ্বাসে নারায়ণদাস লারউডের সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলেন। ওদিকে টাঙ্গা থেকে বিনায়কও নেমে পড়েছে। সে ওঁদের পিছনে পিছনে যেতে লাগল।

নারায়ণদাস শুক্লা এবং বিনায়ককে এই ছোট্ট ডিস্ট্রিক্ট টাউনের কে না চেনে! বিশেষ করে নারায়ণদাস শুক্লাকে। তাঁর মতো এককালের একজন আইডিয়ালিস্ট দেশকর্মীকে একজন সাদা চামড়ার সাহেবের

পিছু পিছু বাঈজীপাড়ায় ঢুকতে দেখে সবাই হকচকিয়ে গেল। এখন একটি কথাও কেউ বলছে না। রুদ্ধশ্বাসে সকলে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে।

বাঈজীপাড়ার মধ্যে ঢুকতে হল না লারউডদের। দেখা গেল দূরের একটা দোতলা বাড়ির ভেতরে থেকে একটা প্রকাণ্ড চেহারার লোক একরকম লাট খেতে খেতে বেরিয়ে আসছে। কাছাকাছি আসতেই দেখা গেল তাঁর গোটা চেহারায় বিন্ধ্যাচলী সিং-এর ছাঁচটা বসানো। তেমনি ঘাড়েগর্দানে ঠাসা, গোলাকার মুখ, উদ্ধত হনু, লাল্‌চে চোখ, এখন এই সকালবেলায় তার চুল উস্কোখুস্কো, চোখের তলায় ইঞ্চি দুই জায়গা জুড়ে ভুষো কালির ছোপ। চোখের দৃষ্টি আধবোজা এবং ঢুলুঢুলু।

তার পরনে ক্যাটকেটে নীলরঙের ব্রীচেস, তার ওপর চিকনের কাজ করা কলারওলা পাঞ্জাবি। পায়ে হরিণের চামড়ার শুঁড়-তোলা জুতো। দু হাতে কম করে সাত-আটটা ঝকমকানো আংটি, গলায় সেনার হার। পাঞ্জাবির হীরে বসানো বোতামগুলো ঝুলছে। পাঞ্জাবি এবং চুস্ত কোঁচকানো মোচকানো। সিগারেটের আগুন লেগে পাঞ্জাবিটার অনেক জায়গায় ফুটো ফুটো হয়ে গেছে। চুস্তের ওপর মাংসের ঝোলের ছাপকা ছাপকা দাগ। পা দুটো টালমাটাল। দেখেই বোঝা যায় সারারাত তুমুল ফুর্তির পর সে এখন ফিরে যাচ্ছে। নেশা এবং আনুষঙ্গিক ফুর্তির খোয়ারি এখনও কাটেনি তার।

নারায়ণদাস ফিসফিসিয়ে লারউডের কানে কানে বললেন, 'বিন্ধ্যাচলী সিং-এর ছেলে বুধোয়ারি।'

লারউড বললেন, 'মুখের ছাঁচ দেখেই সেটা আন্দাজ করতে পারছি।'

খানিকটা ইতস্তত করে নারায়ণদাস আগের মতো নীচু গলায় এবার বললেন, 'বুধোয়ারি যখন বেরিয়ে আসছে তখন গাড়িটা রাস্তা থেকে সরিয়ে দেবেই। ওকে আর কিছু বলার দরকার নেই। ব্যাড এলিমেণ্ট তো।'

অর্থাৎ হাঙ্গামা হুজ্জুৎ আর সম্মানহানির ভয়ে নারায়ণদাস বুধোয়ারির

মতো অ্যান্টি-সোস্থাল বাজে ছোকরাকে ঘাঁটাতে চাইছেন না। লারউড বললেন, এখন না হয় গাড়ি সরাবে কিন্তু এতক্ষণ এতগুলো লোকের অসুবিধা তো করেছে। কিছু না বললে ভবিষ্যতেও করবে। ওকে ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না।'

'কিন্তু—'

লারউড উত্তর দিলেন না। বুধোয়ারি এতক্ষণে তাঁর দশ ফুটের মধ্যে চলে এসেছে। লারউড সোজা তার রাস্তা আটকে দাঁড়ালেন।

ঘাড় গুঁজে এগিয়ে আসতে আসতে থমকে দাঁড়িয়ে গেল বুধোয়ারি। টলটলায়মান মাথাটা কোন রকমে তুলে বলল, 'কৌন্?' তারপর আধভেজা আরক্ত চোখের পাতা দুটো খুলে লারউডকে দেখতে চেষ্টা করল। খ্যাসখেসে গলায় বলতে লাগল, 'মালুম হোতা সাহাব আদমী আংরেজ? আমরিকি? নেই তো রুশী?'

জীবনের অনেকগুলো বছর এখানে কাটিয়ে গেছেন লারউড। মধ্যপ্রদেশের ঠেট হিন্দী তিনি জলের মতো বলতে পারেন। বললেন, 'আমার পরিচয় পরে জানলেও চলবে। তুমি বুধোয়ারি সিং তো?'

মুহূর্তে টলায়মান অবস্থাটা কাটিয়ে নিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াল বুধোয়ারি। একজন অপরিচিত বিদেশীর মুখে নিজের নামটা শুনে অবাকই হয়ে গেছে। গলার স্বরে সামান্য ব্যঙ্গ মিশিয়ে বলল, 'হুজৌর আমার নামটা জানেন দেখছি।'

'তুমি বিন্ধ্যাচলী সিং-এর ছেলে নিশ্চয়ই।' পরিচয়টা জানা সত্ত্বেও বললেন লারউড।

'হুজৌর আমার বাবাকেও চেনেন!'

'আমি তোমাদের সবাইকেই চিনি। তোমার বাবাকে জিজ্ঞেস করে দেখো, সে-ও আমাকে খুব ভালো করেই চেনে।

'তাই নাকি?'

'ইয়েস! তোমার বাবা একবার জেলে গিয়ে তিন মাস ঘানি ঘুরিয়েছিল; পাঁচশো টাকা জরিমানা দিয়েছিল, সেটা জানো?' বলে একটু

থামলেন লারউড। পরক্ষণে আবার শুরু করলেন, 'জেল-জরিমানার ব্যবস্থা করে আমিই তোমার বাবাকে দাগী করে দিয়েছিলাম।'

এবার হকচকিয়ে গেল বুধোয়ারি। কয়েক সেকেণ্ড মাত্র। তার পর তার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। ঢুলু ঢুলু নেশার ভাবটা এখন একেবারেই কেটে গেছে। তীব্র চাপা গলায় সে বলল, 'আপনিই তা হলে লারউড সাহেব! ব্রিটিশ আমলে এখানকার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন?'

'আমার সৌভাগ্য তুমিও আমার নামটা জানো দেখছি।'

আমার বাবাকে আপনি জেলে পুরেছিলেন। ছেলে হিসেবে আপনার নামটা আমার মনে করে রাখাই কর্তব্য। আপনি কী বলেন?'

সামনাসামনি দাঁড়িয়ে কথা বলছে বুধোয়ারি। দেখেই টের পাওয়া যায় মুখ-টুখ এখনও ধোয়া হয়নি। তার মুখ থেকে বাসি হুইস্কির পচাটে গন্ধ ভকভকিয়ে উঠে আসছিল। নাকটা অন্য দিকে ফিরিয়ে লারউড বললেন, 'মনে করে রাখাই তো উচিত। বাপের কথা শুনে ছেলে যদি একটু সমঝে চলে— '

বুধোয়ারি তার ধারালো চোখা দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে এবার বলল, 'আপনার কথা আমার মনে থাকবে ডি. এম. সাহাব। এবার বলুন, এই রেণ্ডিপাড়ায় আমার খোঁজে কী জন্যে এসেছেন? বাবার মতো আমাকেও জেল দেবেন নাকি?' বলে গলার ভেতর অদ্ভুত শব্দ করে খিলখিলিয়ে হেসে উঠল। হাসির তোড়ে তার চর্বি বোঝাই প্রকাণ্ড শরীর দুলতে লাগল।

দাঁতে দাঁত চাপলেন লারউড। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন তিনি। তার আগেই বুধোয়ারি টেনে টেনে আবার বলে উঠল, 'লেকেন ম্যাজিস্টার সাহাব, আমি তো কোন অপরাধ করিনি। যদি বলেন রেণ্ডিপাড়ায় এসেছি এটা একটা ক্রাইম, তা হলে বলব এ রাইট আমার আছে। ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডে কোথাও লেখা নেই যে বাজারের মেয়েমানুষ নিয়ে ফুর্তি করাটা বে-আইনি।' চুক চুক করে জিভের ডগায় শব্দ করতে করতে বলল, 'এ রকম খারাপ পাড়ায়

আপনার মতো মহামান্য লোকের আসা ঠিক হয়নি।'

রাগে মুখ লাল হয়ে উঠেছিল লারউডের। এ রকম বেশরম ছু-কান কাটা ছোকরা জীবনে তিনি ছাখেননি। বাপের বয়সী একটা লোকের সঙ্গে কি ভাবে কথা বলতে হয় তেমন শিক্ষা-সহবৎ কিছুই শেখেনি। লারউডের ইচ্ছা হচ্ছিল আগাপাশতলা চাবকে ছোকরাকে সিধে করে ছ্যান। অতি কষ্টে উত্তেজনা সামলে রক্তাভ মুখে লারউড বললেন, 'তুমি জাহান্নামে এসে যা খুশি কর, আমার তাতে মাথাব্যথা নেই। আমি অন্য কাজে তোমার কাছে এসেছি—'

বুধোয়ারি উত্তর দিতে যাচ্ছিল। হঠাৎ কী মনে পড়ে যেতে বলল, 'দাঁড়ান, দাঁড়ান ম্যাজিস্টার সাহাব, আচ্ছা আমি যে পরীদের এখানে এসেছি এ খবর তো আপনার জানার কথা নয়। কে দিলে খবরটা ?' বলতে বলতে বুধোয়ারির চোখ গিয়ে পড়ল নারায়ণদাসের ওপর। মুহূর্তে তার দৃষ্টির তলা থেকে আগুনের শিসের মতো কিছু একটা উঠে এলো। নারায়ণদাসদের লক্ষ্য করতে করতে বলল, 'ও, আপনারা ?'

লারউড বললেন, 'না, ওঁরা খবর ছ্যাননি। রাস্তার লোকেরা দিয়েছে।'

এ ব্যাপারে আর কোন প্রশ্ন না করে বুধোয়ারি বলল, 'ফরমাইয়ে ডি. এম. সাহাব, আপনার কী সেবায় লাগতে পারি ?'

লারউড দূরে রাস্তার ওপর বিরাট ফোর্ড গাড়িটা দেখিয়ে বললেন, 'ঐ গাড়িটা তোমার ?'

'হাঁ, হুজৌর।'

'রাস্তা আটকে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে রেখেছ কেন ? জানো ছু ধারে কয়েকশো টাঙ্গা আর সাইকেল রিক্শা দাঁড়িয়ে গেছে।'

'জানি ম্যাজিস্টার সাহাব। আমি যেদিনই এ পাড়ায় আসি গাড়িটাকে রাস্তার মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিই। এত বড় ফোড গাড়ি তো এখানে আর কোন শালেকা বাচ্চার নেই। রাস্তার একধারে ফেলে রাখলে কেউ তাকাবে না। মাঝখানে রাখলে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায়

হোক গাড়িটা দেখতেই হবে। এত বড় গাড়ি আমার, অথচ লোকে দেখবে না, তা তো হয় না।'

'এভাবে রাস্তা আটকে লোকের অসুবিধা করা বে-আইনি।'

'এ শহরে রাস্তা তো একটা নয়; যাদের গরজ বেশি তারা অন্য রাস্তায় যেতে পারে।'

লারউড ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, 'আর একটা কথাও আমি তোমার শুনতে চাই না। এই মুহূর্তে গাড়ি সরিয়ে রাস্তা ক্লিয়ার করে দাও। রাইট নাউ। রাস্তাটা তোমার পেটার্নাল প্রপার্টি নয়। গো, কুইক।'

চোখের ভেতরকার সেই হল্কাটা মুহূর্তের জন্য দপ করে উঠল বুধোয়ারিব। দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে সে বলল, 'লারউড সাহাব, আপনি বোধহয় ভুলে গেছেন, এখন আর আপনি এখানকার ডি. এম. নন। আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই, সাতাশ বছর আগে ব্রিটিশ রুল এদেশ থেকে গুড-বাই করেছে।'

'মনে করিয়ে দিতে হবে না। আমার মেমারি এই বয়সেও অতটা উইক হয়ে যায়নি। কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে একটু-আধটু লেখাপড়া শিখেছ—'

'স্কুল থেকে বেরিয়ে বছর চারেক কলেজে ঘোরাঘুরি করেছি।'

'তাহলে নিশ্চয়ই তোমার জানা উচিত ব্রিটিশ রুল চলে গেলেও রুল অফ ল নিশ্চয়ই এদেশে আছে।' বলতে বলতে গলার স্বর রূঢ় হয়ে উঠল লারউডের, 'অনেকক্ষণ লোককে ট্রাব্‌ল দিয়েছ। এই মুহূর্তে গাড়ি সরিয়ে দাও—'

বুধোয়ারির কপালের দু-ধারের রগগুলো দপ দপ করতে লাগল; শরীরের সব রক্ত তার চোখে মুখে উঠে এসেছে। মনে হচ্ছে হঠাৎ এক লাফে তার রক্ত-চাপ দশ গুণ বেড়ে গেছে। বুধোয়ারি বলল, 'আপনার মতো একজন ফরেনারের হুকুমে গাড়ি সরাব?'

'ইয়েস। অ্যাণ্ড ডু ইট কুইক। স্কাউণ্ড্রেল, শেমলেশ ক্রিচার! তোমাকে চাবকে সিধে করে দেওয়া উচিত।' শরীরের সবটুকু শক্তি

গলায় ঢেলে চিৎকার করে উঠলেন লারউড।

সাদা চামড়ার মানুষ বলেই হোক, কিংবা এই মুহূর্তে ভয়াবহ মারমুখী চেহারা দেখেই হোক, বুধোয়ারি অনেকখানি মিইয়ে গেল। তিন পা পিছু হটে এক পলক তাকিয়ে থাকল সে। তারপর একটি কথাও না বলে সোজা কালভার্ট পেরিয়ে রাস্তায় চলে গেল।

লারউডরাও পেছন পেছন চলে এসেছিলেন। ফোর্ড গাড়িটায় উঠে স্টার্ট দিতে দিতে একবার জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বুধোয়ারি বলল, 'ম্যাজিস্টরকে বাচ্চে, তোমাকে আমার মনে থাকবে।'

লারউড হাসতে হাসতে বললেন, 'থাকাই তো উচিত।'

'এই শহরে যদি তিনটে দিনও থাক, তোমার সঙ্গে আবার আমার দেখা হবে।'

লারউড বললেন, 'নিশ্চয়ই দেখা হবে। দেখা হওয়াটা বোধহয় ভীষণ দরকার। একটা কথা জেনে রাখ, আমি ফরেনার হই আর যা-ই হই তোমাকে টিট করবার ক্ষমতা এখনও আমার আছে।'

গাড়িটা চলতে শুরু করেছিল। বাছা বাছা অকথ্য এবং অশ্লীল কয়েকটা খিস্তি আউড়ে হঠাৎ দারুণ স্পীড তুলে ফেলল বুধোয়ারি, তারপর চোখের পলকে একটা বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

নারায়ণদাস সমস্ত ঘটনার জন্য খুবই কষ্ট পাচ্ছিলেন। বললেন, 'একেবারে ইতর।'

লারউড সামান্য হাসলেন, 'আর কাওয়ার্ডও। খিস্তিখেউড় করার পর কি রকম পালিয়ে গেল দেখেছেন!'

ওঁরা ভোলার টাঙ্গার কাছে চলে এসেছিলেন। নারায়ণদাস বললেন, 'আপনার কাছে একটা আর্জি আছে স্যার।'

'কী?'

'যে ক'টা দিন এখানে আছেন, একটু সাবধান মতো থাকবেন। এলিমেন্টটা খুব খারাপ কি না?'

'আপনি ভাববেন না শুক্লাজী। এ জাতীয় লোকদের ট্যাক্‌ল করার

মতো শক্তি এখনও আমার আছে। আপনি তো জানেনই আপনাদের এই শহরে পনেরো-কুড়িটা বছর কত রকম ক্রিমিন্যাল নিয়ে কাটিয়ে গেছি।'

টাঙ্গায় উঠতে উঠতে নারায়ণদাস বললেন, 'কিন্তু এখন তো বয়স হয়েছে।' তা ছাড়া, একটু থেমে দ্বিধান্বিতভাবে বললেন, 'আপনি এখন এদেশের, মানে—'

'মানে এদেশের লোক নই, এই তো?'

বিব্রতভাবে নারায়ণদাস বললেন, 'হ্যাঁ।'

'তাতে কী হয়েছে—' টাঙ্গায় উঠতে উঠতে লারউড বললেন, 'শুক্লাজী, আপনি আমার জন্যে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন কিন্তু আমি জানি আইন আর ন্যায় পুরোপুরি আমার পক্ষে। আর আপনিও নিশ্চয়ই জানেন ন্যায়ের আলাদা কোন ন্যাশনালিটি নেই; ওটা ইউনিভার্সাল।'

নারায়ণদাস কিছু বললেন না।

লারউড উঠে পড়েছিলেন। বিনায়ককে তিনি বললেন, 'কী— তোমার দাদাজীকে যা বললাম সেটা ঠিক কিনা?'

বিনায়ক বলল, 'নিশ্চয়ই ঠিক। কিন্তু—'

লারউড তার পিঠে আলতো করে চাপড় মেরে বললেন, 'তুমিও দাদাজীর মতো ঐ বদমাসটার কথা ভাবছ! তোমাকে আমি বলছি, আমার ক্ষতি করা দূরের কথা, চামড়া পর্যন্ত ও টাচ করতে পারবে না।'

ও দিকে চারপাশের মানুষ জন থ হয়ে সমস্ত ব্যাপারটা দেখছিল। বুধোয়ারি সিংয়ের মতো একটা পাকা হারামী এবং জঘন্য ধরনের ছোকরাকে এভাবে কেউ শায়েস্তা করতে পারে, নিজের চোখে দেখেও তারা যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। চাপা গলায় দু-একজন বলল, 'বহোৎ জবরদস্ত সাহাব। শালে হারামজাদকো বাচ্চাকা সিধা কর দিয়া।'

লারউডরা গাড়িতে উঠতেই ভোলা ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছিল। আবার পাথর বাঁধানো রাস্তায় অশ্বক্ষুরের শব্দ উঠতে লাগল, 'টকাটক্ টক্ টক—'

৩

ধমতোর শহরের শেষ মাথায় নারায়ণদাস শুক্লার পুরনো আমলের দোতলা বাড়ি। সামনের দিকে অনেকখানি কম্পাউণ্ড। এককালে লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা ছিল। এখন তার চিহ্নমাত্র নেই। মোটা মোটা থাম আর বড় বড় সিঁড়ি দেখে গথিক স্ট্রাকচারের কথা মনে পড়ে যায়।

বাড়িটা করিয়েছিলেন নারায়ণদাসের ঠাকুরদা রায়বাহাদুর জগমোহন-দাস শুক্লা। জগমোহন ছিলেন বিরাট বিজনেসম্যান। কলকাতায় তাঁর হেসিয়ান আর চায়ের কারবার ছিল। দিবারাত্রি জগমোহনের ছিল একটাই মাত্র ধ্যান। সেটা হল উঠতে-বসতে চলতে-ফিরতে সর্বক্ষণ ইংরেজ ভজনা। নিজে ছিলেন পাকা নিরামিষাশী এবং পায়ের তলা থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত টিটোটেলার। কিন্তু বড়দিনে কি পয়লা জানুয়ারীতে তো বটেই, ফি মাসেই সাহেবদের বাড়িতে নিয়ম করে হুইস্কির পেটি, ফল ও কেকের বাক্স আর ডজন ডজন নধর স্বাস্থ্যবান মুরগী ভেট পাঠাতেন। শোনা যায় প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ওয়ার ফাণ্ডে পাঁচ লাখ টাকা দান করেছিলেন। এতে লাভই হয়েছিল। ইংরেজদের সুনজরে পড়ায় জগমোহন শুক্লার ব্যবসা চড়চড়িয়ে বেড়ে গিয়েছিল। ইংরেজ অকৃতজ্ঞ নয়। ওয়ার ফাণ্ডে টাকা দেওয়ার প্রতিদান স্বরূপ তাঁকে রায়বাহাদুর খেতাব দেওয়া হয়েছিল। লাটসাহেবের বাড়িতে বিশেষ বিশেষ খানাপিনার আসরে তাঁর নিমন্ত্রণ ছিল অবধারিত। সারা দেশে এমন ইংরেজ ভক্ত লোক সে আমলে খুব বেশি ছিল না। যে কোন ইংরেজকে সে ছোটই হোক আর বড়ই হোক, চিঠি লেখার সময় তলায় লিখতেন—'ইওর মোস্ট ওবেডিয়েন্ট সারভেন্ট রায়বাহাদুর জগমোহন-দাস শুক্লা।'

জগমোহন কলকাতার নামকরা বিলিতী আর্কিটেক্টারকে দিয়ে এই

বাড়ির প্ল্যান করিয়েছিলেন। সে আমলেই এটা তৈরি করতে খরচ হয়েছিল দু লাখ টাকার ওপর।

জগমোহনের দুর্ভাগ্য তাঁর ছেলে ছবিলদাস শুক্লার মাথায় ব্যবসা-ট্যবসা ব্যাপারটা আদপেই ঢুকত না। তা ছাড়া ইংরেজদের দরজায় দরজায় চাপরাশীদের মতো ঘুরে ঘুরে সেলাম ঠোকাও তাঁর ধাতে ছিল না। ছবিলদাস ছিলেন অসাধারণ ভালো ছাত্র। দিন রাত পড়াশোনা নিয়ে থাকতেই ভালোবাসতেন। আর ভালোবাসতেন নিজের মধ্যে গুটিয়ে থাকতে। বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি থেকে সে আমলে ফিলজ-ফিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছিলেন। স্বাধীনচেতা বলে একটা কথা আছে; ছবিলদাস ছিলেন তাই। জগমোহনদাসের ইচ্ছা ছিল ইউনি-ভার্সিটি থেকে বেরুবার পর সে আমলের বড় বড় সাহেবদের কাছে নিয়ে গিয়ে ছেলেকে পরিচয় করিয়ে দেবেন। ইংরেজদের সেলাম ঠুকে ঠুকে যে বিশাল বিজনেস তিনি গড়ে তুলেছিলেন পুরুষানুক্রমে মসৃণ নিয়মে সেটা গড়গড়িয়ে চলতে থাকবে কিন্তু ছেলে সেদিক দিয়েও গেল না। গভীর দুঃখ এবং আক্ষেপের সঙ্গে জগমোহন লক্ষ্য করলেন ছবিলদাস বেনারস থেকে ফিবে ধমতোরির এক দিশী ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে ষাট টাকা মাইনের মাস্টারি নিলেন। ক্ষোভে এবং রাগে ছেলের সঙ্গে পারতপক্ষে তিনি কথা বলতেন না।

ছবিলদাসের ছেলে নারায়ণদাস শুক্লা আরেক কাঠি ওপরে গেলেন। বাবার মতো তিনি অত ভালোছাত্র ছিলেন না তবু কলকাতা থেকে এম. এ-টা পাস করেছিলেন। সেখানেই তিনি দেখেছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে, মতিলাল নেহরু, গান্ধীজী, গোখেল এবং তরুণ জওহরলাল আর সুভাষচন্দ্রকে। ইংরেজভজা ঠাকুরদার নাতিব মধ্যে এঁরা আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। বাবা ছবিলদাস তবু কলেজ আর পড়াশোনা নিয়ে ছিলেন। নারায়ণদাস ওসব দিকেই গেলেন না। গান্ধীজীর ডাকে প্রথমে সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিছুদিন জেল খেটে বেরিয়ে আসার পর দেশকে আত্মনির্ভর

এবং স্বাবলম্বী করার জন্য ঘরে ঘরে চরকার প্রচার শুরু করলেন। তারপর এলো নন-কোঅপারেশনের ডাক। আবার জেলে গেলেন নারায়ণদাস। এর আগেই তাঁর বিয়ে হয়েছে এবং একটি ছেলেও হয়েছে। সেই ছেলে বিনোদই হচ্ছে বিনায়কের বাবা।

এই নন-কোঅপারেশন মুভমেণ্টের কিছু আগে লারউডের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল নারায়ণদাসের। তিনি তখন সবে ধমতোরিতে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এসেছেন।

নন-কোঅপারেশনের পর একে একে আরো কত মুভমেণ্ট। মধ্যপ্রদেশের এই জেলায় স্বাধীনতার যাবতীয় আন্দোলনের একেবারে সামনে নারায়ণদাস।

ইংরেজ ভক্ত জগমোহনদাস শুক্লা একক প্রচেষ্টায় যে বিজনেস এম্পায়ার গড়ে তুলেছিলেন সেকেণ্ড জেনারেসনেই অর্থাৎ নারায়ণদাসের আমলে এসে তার আর অস্তিত্ব ছিল না। জগমোহনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার ব্যবসা-পত্তর নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। যা অ্যাসেট ছিল, কর্মচারীরা সব লুটেপুটে নিয়েছে।

ব্যবসা নেই, কাজেই টাকা-পয়সা আসার রাস্তাও বন্ধ। ঠাকুরদা ষাট সত্তর বছর আগে যে বিরাট গথিক স্ট্রাকচারের বাড়ি তৈরি করে গিয়েছিলেন তার পলেস্তারা খসে খসে বেশির ভাগ জায়গাতেই ইঁট বেরিয়ে পড়েছে। দেয়াল এবং নিরেট বিরাট বিরাট থামে লম্বা লম্বা ফাটল ধরেছে। আর সেই ফাটলের ফাঁকে অশ্বত্থেরা শিকড় চালিয়ে চালিয়ে ধ্বংসের কাজ অনেকখানিই এগিয়ে রেখেছে। সিঁড়িগুলোতেও চিড় ধরেছে; সেখানেও প্রচুর ঘাস আর আগাছা গজিয়ে আছে। কত কাল যে এ বাড়ি মেরামত করা হয়নি, গায়ে কলি পড়েনি। খদ্দর বেচে নারায়ণদাসের যা রোজগার তাতে এ সবের কিছুই হয় না। ইদানীং না হয় কলেজে চাকরি পেয়েছে। মাইনে আটশো টাকার মতো। দশ বছর না খেয়ে না খেয়ে মাইনের পুরো টাকাটা জমলে এ বাড়ির খানিকটা মেরামত হয়তো করা যায়।

ভোলা তার টাঙ্গা নিয়ে নারায়ণদাসের বাড়ির কম্পাউণ্ড পেরিয়ে একেবারে সিঁড়ির কাছে এসে থামল।

গাড়ি থেকে নেমে বাড়ির এ মাথা থেকে সে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে নিলেন লারউড। তারপর বললেন, 'সাতাশ বছর আগে যা দেখে গেছি বাড়িটার হাল দেখছি তার চাইতেও খারাপ হয়ে গেছে।'

নারায়ণদাস আর বিনায়কও লারউডের স্যুটকেস বিছানা নিয়ে নেমে পড়েছিল। নারায়ণদাস বললেন, 'হ্যাঁ, যে কোন দিন ভেঙে পড়তে পারে। সেদিন তো পিছন দিকের ব্যালকনিটা সামান্য ভূমিকম্পেই ধসে পড়ল।'

লারউড রগড়ের ভঙ্গিতে বললেন, 'আপনি কিছু করতে পারেননি দেখছি।'

বুঝতে না পেরে নারায়ণদাস জিজ্ঞেস করলেন, 'কী করার কথা বলছেন?'

লারউড বললেন, 'লণ্ডনে থাকতে শুনেছি ব্রিটিশ আমলের অনেক ফ্রীডম ফাইটার ইণ্ডিপেণ্ডেন্সের পর আখের গুছিয়ে নিয়েছে। আপনি দেখছি নিজেদের বাড়িটাও সারাতে পারেননি।'

নারায়ণদাস বললেন, 'পরাধীন ভারতে জেল খাটাটা ইনভেস্ট করে, স্বাধীনতার পর সুদসুদ্ধ ডিভিডেণ্ড আদায় করব—এটা আমি ঘৃণা করি।

লারউড হেসে বললেন, 'না, আইডিয়ালিস্টরা পৃথিবীর সব দেশে চিরকাল একই রকম থেকে যায়। শুক্লাজী, আপনার কিছু হল না।'

নারায়ণদাস হাসলেন, 'তা যা বলেছেন।'

বিনায়ক মালপত্র নিয়ে নেমে পড়েছিল। ভোলাকে ভাড়া দিতে গেলে সে কিছুতেই নিল না। বার বার জিভ কেটে আর কান ধরে সে লারউড সম্পর্কে বলতে লাগল, 'হুজৌর মা-বাপ, একদিন তার জান বাঁচিয়েছেন, কোন দিন সে তাঁর সেবা করার সুযোগ পায়নি। স্টেশন থেকে তাঁকে টাঙ্গায় করে নিয়ে এসেছে; এর জন্য ভাড়া নিতে হলে তার দুঃখের শেষ থাকবে না।'

লারউড ভোলা আর বিনায়কের কথা শুনতে পেয়েছিলেন। ভোলাকে বললেন, 'ঠিক আছে, এই একবারই কিন্তু। এরপর তোর টাঙ্গায় উঠলে কিন্তু পয়সা নিতে হবে।'

ভোলা বলল, 'হুজৌর মা-বাপ, আপনার কাছ থেকে আমি কোন দিনই কেরায়া নিতে পারব না। আপনি যে ক'দিন আছেন এই টাঙ্গাতেই চড়বেন।'

'পাগল কোথাকার! আচ্ছা, তুই এখন যা।'

ভোলা চলে গেল। নারায়ণদাস বললেন, 'চলুন স্যার, বাড়ির ভেতরে যাই—'

'হ্যাঁ চলুন—'

স্যুটকেস আর হোল্ড-অল নিয়ে বিরাট বিরাট সিঁড়ি ভেঙে আগে আগে ওপরে উঠতে লাগল বিনায়ক। তার পিছনে লারউড আর নারায়ণদাস চড়াই ভাঙতে লাগলেন।

মোট পঁচিশটা সিঁড়ি। তারপর থামওলা প্রকাণ্ড বারান্দা। ওপরে আসতেই দেখা গেল চৌষট্টি-পঁয়ষট্টি বছরের এক বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে আছেন। গায়ের রঙ এই বয়সেও পাকা গমের মতো। সময়ের কিছু কিছু রেখা পড়লেও তাঁর ত্বক এখনও মসৃণ। পানপাতার মতো মুখ, সরু চিবুক, ছোট্ট কপাল, সিঁথির দু'ধারে প্রায় সব চুলই রুপোর তার হয়ে গেছে। সারা মুখে পৃথিবীর পবিত্রতম হাসিটি মাখানো। পরনে সাদা ধবধবে খোলের নীল-পাড় খদ্দরের শাড়ি। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। ইনি নারায়ণদাস শুক্লার স্ত্রী দুর্গাবতী।

দুর্গাবতী হাতজোড় করে এগিয়ে এলেন। স্নিগ্ধ গলায় বললেন, 'আসুন ম্যাজিস্টেট সাহেব, আসুন।'

লারউড এক রকম দৌড়েই দুর্গাবতীর কাছে চলে এলেন। তাঁর দু'-হাত ধরে বললেন, 'ভালো আছেন ভাবীজী?' সেই নাইন্টিন টোয়েন্টি নাইন থার্টি থেকেই দুর্গাবতীকে ভাবীজী বলে এসেছেন লারউড।

'ভালো আছি। আপনি ভালো তো?'

'খুব ভালো।'

'আপনার জন্যে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি। ট্রেন কি লেট ছিল?'

নারায়ণদাস বললেন 'আর বোলো না, রাস্তায় আসতে আসতে স্যার এক কাণ্ড করে বসেছেন। সেই জন্যেই তো দেরি হয়ে গেল!'

উদ্বিগ্ন মুখে দুর্গাবতী বললেন, 'কী করেছেন?'

'পরে শুনো। এখন স্যারকে ঘরে নিয়ে চল।'

দুর্গাবতী ব্যস্তভাবে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আসুন—'

পাশাপাশি ভেতরে যেতে যেতে লারউড বললেন, 'ভাবীজী আপনি এখনও তিরিশ বছর আগের মতোই ফ্রেশ ইয়াং গার্লটি হয়ে আছেন।'

দুর্গাবতীর সঙ্গে লারউডের সম্পর্কটা চিরকালই ঠাট্টার। তিনি হাসতে হাসতে লাজুক মুখে বললেন, 'কী যে বলেন, পঁয়ষট্টিটা বছর পার করে ফেললাম। মাথার একটা চুলও কি আর কালো আছে? এখনও বলছেন আমি যুবতীটি আছি! বরং আপনিই কাঁচা ছোকরাটি হয়ে রয়েছেন।'

'বলছেন!'

'একশোবার। বয়স থেকে তিরিশ-চল্লিশটা বছর তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছেন মহাশয়।'

নারায়ণদাস রগড়ের গলায় বললেন, 'তোমরা দুজনে দেখছি ষাট-সত্তর বছর বয়সেও যুবক-যুবতী হয়ে রইলে। আমি কিন্তু থুথ্‌ড়ে ওল্ড ম্যান হয়ে গেছি।'

সবাই হাসতে লাগল।

কথায় কথায় এক সময় ওঁরা এ বাড়ির দক্ষিণ দিকের প্রকাণ্ড একটা ঘরে চলে এলেন। কুড়ি বাই পঁচিশ মাপের এই ঘরটার মেঝে চৌকো চৌকো সাদা মার্বেলে বাঁধানো। মেঝে থেকে কড়িকাঠ কম করে কুড়ি বাইশ ফুট উঁচুতে। এক ধারে পুরনো আমলের পঙ্খের কাজ করা বিশাল খাট, সিংহাসনের মতো ভারী ভারী সোফা, আয়না বসানো প্রকাণ্ড আলমারি ইত্যাদি ইত্যাদি। ঘরের সঙ্গে অ্যাটাচড্‌ বাথরুমও রয়েছে।

খাটে ধবধবে বিছানা পাতা। সোফা-টোফায় সাদা কভার লাগানো রয়েছে। কড়িকাঠ থেকে কালিঝুলি মাখা ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে। এক সময় ওগুলোর ভেতর মোমের আলো জ্বলত। কিন্তু ভিক্টোরিয়ান যুগের ম্যাণ্ডেলিয়ারগুলোর ভেতর এখন বংশ-পরম্পরায় পায়রারা বসবাস করছে। দেওয়াল থেকে টাটকা চুনের গন্ধ উঠে আসছিল। দেখেই টের পাওয়া যায় লারউড আসবেন বলে এত বড় বাড়ির এই একটা ঘরের কলি ফেরানো হয়েছে। এ ঘরের জানলাগুলো বিরাট বিরাট, প্রায় দরজার সমান। পূর্ব-দক্ষিণ পুরোপুরি খোলা। সেখান থেকে হু-হু করে বাতাস ছুটে আসছিল।

দুর্গাবতী বললেন, 'এই ঘরটা আপনার।'

লারউড গোটা ঘরখানা দ্রুত দেখে নিলেন। তারপর ছেলেমানুষের মতো একবার জানলাগুলোর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। নারায়ণদাসদের বাড়িটা একেবারে শহরের শেষ মাথায়। এখানকার যে কোন ঘরের জানলায় দাঁড়ালে ধু-ধু মাঠ, দূরের অস্পষ্ট বনভূমি এবং তার গায়ে পাহাড়ের রেঞ্জ চোখে পড়ে।

জানলার কাছ থেকে একটু পর ফিরে এসে লারউড বললেন, 'ফাইন।'

দুর্গাবতী বললেন, 'আপনাকে নিজেদের একজন ভাবি। তাই সাহস করে আমাদের কাছে আপনার থাকার ব্যবস্থা করেছি।'

'কী আশ্চর্য, আমি আপনাদেরই একজন তো। আপনজনদের কাছে থাকতে আমার ভীষণ ভালো লাগবে।'

'তা জানি। সেই জন্যেই তো হোটেলে উঠতে দিইনি। কোন রকম সঙ্কোচ করবেন না। যখন যা দরকার বলবেন।'

'আপনি তো জানেন, সঙ্কোচ-টঙ্কোচ আমার নেই। দু'দিনেই আপনাকে ঝালাপালা করে ছাড়ব।'

সেই নাইন্টিন 'টায়েন্টিনাইন থার্টি থেকেই দুর্গাবতী আর লারউডের সম্পর্কটা বৌদি আর সমবয়সী দেওরের মতো। দুর্গাবতী বললেন,

'দেখব আমাকে কতটা ঝালাপালা করতে পারেন।' একটু থেমে বললেন, 'সারা রাত ধকল গেছে; এখন বিশ্রাম করে মুখ-টুখ ধুয়ে নিন। স্নানটাও করে নিতে পারেন।' অ্যাটাচড্ বাথরুম দেখিয়ে বললেন, 'ঐ যে স্নানের জায়গা। স্নান করলে গরম জল পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

সকালের দিকেই স্নান করার অভ্যাস লারউডের। বললেন, 'তাই পাঠিয়ে দিন। স্নানটা করেই ফেলি।'

দুর্গাবতী নারায়ণদাস আর বিনায়ককে নিয়ে চলে গেলেন। আর লারউড একটা বিরাট সোফায় নিজের শরীর ঢেলে দিলেন। জানলার বাইরে নভেম্বরের আকাশ কী নীল। তার গায়ে একফোঁটা মেঘ নেই। অজস্র কুচি কুচি রঙিন কাগজের মতো হাজার হাজার পাখি আকাশ জুড়ে উড়ছে।

পাখির ঝাঁক, পাহাড়ের আবছা রেঞ্জ, নীলাকাশ আর গলানো গিনির মতো টলটলে সোনালী রোদ দেখতে বড় ভালো লাগছিল। লণ্ডনের আকাশ তো প্রায় সারা বছরই কুয়াশায় ঝাপসা। সর্বক্ষণ স্যাঁতসেঁতে কুহেলিবিলীন আবহাওয়া দেখতে দেখতে মনের ওপরও যেন প্রভাব পড়ে যায়। কত কাল পর চোখের সামনে তিনি এত উজ্জ্বল রোদ আর ল্যাণ্ডস্কেপ দেখলেন। উল্টো-পাল্টা বাতাস শরীরের ওপর দিয়ে সুখের স্রোত হয়ে যেন বয়ে যাচ্ছিল।

এক সময় খুট করে শব্দ হল। ঘাড় ফিরিয়ে লারউড দেখলেন একটা আধবুড়ো মেয়েমানুষ, চেহারা দেখে এ বাড়ির কাজের লোক মনে হয়, বিরাট একটা প্লাস্টিকের বালতি ভর্তি ধোঁয়ানো গরম জল বাথরুমে রেখে গেল।

জলটা গরম থাকতে থাকতেই স্নান সেরে নেওয়া দরকার। বিনায়ক ঘরের এক ধারে তাঁর স্যুটকেস হোল্ড-অল রেখে গিয়েছিল। লারউড স্যুটকেস খুলে তোয়ালে, টুথ ব্রাস, বাড়ির পোশাক ইত্যাদি বার করে বাথরুমে চলে গেলেন।

স্নানের পর বাইরে এসে বসে তিনি সোফায় বসেছেন, সেই সময় দুর্গাবতীরা আবার এলেন ঘরে। দুর্গাবতী, বিনায়ক এবং নারায়ণদাস তো আছেনই, তাঁদের সঙ্গে আর একজন মহিলাকে দেখা গেল। তাঁর বয়স চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশের মতো। গায়ের রং কালোও না ফসাও না। লম্বাটে মুখ, ঘন পালকে ঢাকা বড় বড় চোখ, সরু চিবুক। মহিলা বেশ লম্বা এবং সুদেহিনী। ভারতীয় মেয়েদের মধ্যে এমন হাইট কদাচিৎ দেখা যায়। তাঁর পরনে সাদা ধবধবে পোশাক, হাতে দু গাছা করে সোনার চুড়ি, দেখেই বোঝা যায় বিধবার সাজ। মহিলার সমস্ত আকর্ষণ তাঁর চোখ-মুখে। এমন বিষাদময় মুখ এবং চাউনি ক্বচিৎ কখনো চোখে পড়ে। তাঁর হাতে বিরাট একটা ট্রে-তে অনেকগুলো প্লেট আর টীপট-টট সাজানো। প্লেটগুলোতে রুটি মাখন কেক ডিমের অমলেট ইত্যাদি রয়েছে। দেখেই টের পাওয়া যায়, এই ট্রে বা ক্রকারী সবই নতুন। লারউড আসবেন বলেই হয়তো কেনা হয়েছে।

বিনায়ক লারউডের সামনে একটা টেবল টেনে এনে রাখল। সেই মহিলাটি ট্রে নামিয়ে প্লেটগুলো সাজিয়ে দিলেন। নারায়ণদাস আর দুর্গাবতী মুখোমুখি আরেকটা সোফায় বসলেন। বিনায়ক একপাশে দাঁড়িয়ে রইল।

লারউড মহিলাটির দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আগে কখনও দেখেছেন বলে মনে করতে পারলেন না। বললেন, 'এঁকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না—'

নারায়ণদাস বললেন, 'আমাদের বউমা, বিনায়কের মা। ওর নাম মাধুরী।'

ততক্ষণে মাধুরী ঝুঁকে লারউডের পায়ের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। লারউড বিব্রতভাবে নিজের পা গুটিয়ে নিতে নিতে বললেন, 'না-না-না—' কিন্তু তার আগেই মাধুরী প্রণাম করে ফেলেছেন।

লারউডের মনে পড়ে গেল, ওর কথাই স্টেশনে বলেছিলেন নারায়ণ-

দাস। ··উঠে দাঁড়িয়ে মাধুরীর একটা হাত ধরে সস্নেহে নিজের পাশে বসালেন লারউড। বললেন, 'বিনোদ ছিল আমার ছেলের মতো। তোমাদের বিয়ের আগেই আমি লণ্ডন চলে গিয়েছিলাম তাই তোমাকে আগে দেখিনি।' একটু থেমে ভারী গলায় বললেন, 'তোমাকে এই প্রথম দেখলাম কিন্তু এই সাজে দেখব ভাবিনি।'

হঠাৎ ঘরের বাতাসে গভীর বিষাদ ছড়িয়ে গেল যেন। সবাই চুপ করে রইলেন। অনেকক্ষণ পর শিথিল গলায় নারায়ণদাস বললেন, 'সবই আমাদের বরাত।'

'কী হয়েছিল বিনোদের? খারাপ কিছু অসুখ-বিসুখ? এত কম বয়েসে তো ওর চলে যাবার কথা নয়।'

'অসুখ-বিসুখে মারা যায়নি।'

'তাহলে?'

'মারা গেছে আগুনে পুড়ে।'

লারউড চমকে উঠলেন, 'আগুন লাগল কী করে?'

নারায়ণদাস বললেন, 'বিন্ধ্যাচলী সিং-এর লোকেরা হরিজনদের পাড়ায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। বিনোদ ওদের বাঁচাতে গিয়ে পুড়ে যায়। সারা গা জুড়ে বড় বড় ফোস্কা পড়েছিল। হাসপাতালে তিনদিন সেন্সলেস হয়ে থাকার পর ছেলেটা চলে গেল।' বলতে বলতে তাঁর গলা বুজে এলো; সাতষট্টি-আটষট্টি বছরের জ্যোতিহীন চোখ ঝাপসা হয়ে যেতে লাগল।

লারউড শিউরে উঠেছিলেন। লক্ষ্য করলেন দুর্গাবতী এবং মাধুরীর চোখও জলে ভরে গেল। লারউড বললেন, 'প্রি-ইণ্ডিপেনডেন্স পীরিয়ডে কাস্ট-ইজ্‌ম মানে জাত-পাতের যে প্রবলেমগুলো ছিল এখনও সে সব আছে নাকি?'

নারায়ণদাস বললেন, 'আছে।'

'খুবই দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার। স্বাধীন ভারতে এ সব থাকা উচিত নয়।'

কেউ উত্তর দিল না।

অনেকটা সময় চুপচাপ। তারপর হঠাৎ দুর্গাবতীর খেয়াল হল, খাবার-দাবার এবং চা জুড়িয়ে যাচ্ছে। লারউড কিছুই স্পর্শ করেননি। ব্যস্ত হয়ে তিনি বললেন, 'এ কি, কিছুই খাচ্ছেন না—'

নারায়ণদাসও ঝুঁকে পড়লেন, 'খান স্যার, খান। সব কিছু ঠাণ্ডা হয়ে গেল।'

'হ্যাঁ খাচ্ছি—' প্লেটের দিকে হাত বাড়াতে গিয়ে লারউড প্রায় আঁতকে উঠলেন, 'এ কি, ডিম কেন?' তিনি জানেন নারায়ণদাস শুক্লারা বিশুদ্ধ ভেজিটেরিয়ান। মাছ-মাংস-ডিম তো ছোঁনই না, পেঁয়াজ-রসুন পর্যন্ত বাড়িতে ঢুকতে পারে না। শুধু তিনি এসেছেন বলেই বাড়িতে ডিম ঢুকেছে। শুধু তাই না, নিজের হাতে প্লেটে সাজিয়েমাধুরী নিয়েও এসেছেন।

নারায়ণদাস বললেন, 'আপনি তো আমাদের মতো ভেজিটেরিয়ান নন। তাই—'

লারউড বললেন, 'এখন ডিমটা খাচ্ছি এরপর থেকে আপনারা যা খাবেন আমাকেও তাই দেবেন। আমার জন্য আলাদা কোন ব্যবস্থা করবেন না।'

'কিন্তু ভেজিটেবলস্ খেতে আপনার ভীষণ অসুবিধা হবে।'

কোন অসুবিধা হবে না। আপনারা নিজেরাই বলেছেন আমাকে এ বাড়ির লোক মনে করেন। এ মেম্বার অফ ইওর ফ্যামিলি। আমার সঙ্গে বাইরের অতিথিদের মতো ব্যবহার করলে দুঃখ পাব।'

দুর্গাবতী বললেন, 'ঠিক আছে, আপনার যখন আমাদের সঙ্গে শাকপাতা চিবোবার ইচ্ছে হয়েছে, তখন কী আর করব।'

খেতাব-টেতাব জুড়লে লারউডের পুরো নামটা এই রকম। স্যার স্টিফেন ম্যাকডুগল লারউড। ইয়র্কশায়ারের এক বিখ্যাত পরিবারের ছেলে তিনি। লণ্ডনের অভিজাত পাড়ায় তাঁদের বাড়ি আছে।

লারউড পরিবারের পরিচয় গর্ব করে দেবার মতো। স্টিফেন লারউডের ঠাকুরদা হেনরি লারউফ ছিলেন হাইকোর্টের চীফ জাস্টিস। বাবা ম্যাকডোনাল্ড লারউড অক্সফোর্ডে ফিলজফির নাম-করা অধ্যাপক। এক কাকা ছিলেন ধর্মযাজক। আরেক কাকা প্রথম জীবনে ডাক্তার, পরে মিশনারী হয়ে আফ্রিকার দুর্গত মানুষদের সেবার জন্য চলে যান। বড় পিসীমা আমেরিকায় নিগ্রোদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদ জানাতে তাঁর যৌবনে সেখানে চলে যান। গিয়েই বুঝেছিলেন শুধু হোয়াইট হাউসের সামনে স্লোগান দিয়ে, মিছিল বার করে কিছুই করা যাবে না। আসলে বাইরে থেকে বিশেষ কিছু করা যাবে না। কারো জন্য কিছু করতে হলে তাদের একজন হয়ে যেতে হয়। বড় পিসীমা একজন নিগ্রো মিউজিসিয়ানকে বিয়ে করে সাউথ আমেরিকায় থেকে গেছেন। আমেরিকার সমাজে নিগ্রোদের ন্যায্য মর্যাদা আর প্রতিষ্ঠার জ[illegible] বাকী জীবন তিনি সংগ্রাম করে গেছেন। ছোট পিসীমার বিয়ে হয়েছিল ল্যাঙ্কাশায়ারে। তিনি সেখানকার জাস্টিস অফ পীস। স্টিফেন লারউডের দাদা ম্যাকিনন লারউড পূর্ব-এশিয়ার একজন বিশপ। থাইল্যাণ্ডে থাকেন। তাঁর কাজ হল খ্রীষ্টধর্মের প্রচার এবং পূর্ব-এশিয়াবাসীদের সেবা। একমাত্র বোন লরা কাজ করেন লণ্ডনের ইণ্টারন্যাশনাল বাইবেল সোসাইটিতে।

এই পরিবারের সন্তান স্টিফেন লারউড ছিলেন অক্সফোর্ডের অসাধারণ ছাত্র। তাঁর পরিবারের ব্যাকগ্রাউণ্ডে ছিল তিনটি অনন্য মানবিক গুণ—ধর্ম, ন্যায়বিচার এবং মানুষের প্রতি মমতা। এই তিনটি দুর্লভ বস্তুই লারউড পরিবারের কনিষ্ঠ সন্তান লারউডের মধ্যে ছেলে-

বেলা থেকে ফুটে উঠেছে। জগৎ সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি উদার এবং স্বচ্ছ। মানুষ, বিশেষ করে দুঃখী মানুষ সম্পর্কে তাঁর মনে প্রগাঢ় সহানুভূতি।

ছেলেবেলো থেকে নিজের লেখাপড়া বাদে অন্য যা লারউডকে গভীরভাবে আকর্ষণ করেছিল সেটা হল ওরিয়েণ্টোলজি। পূর্ব-গোলার্ধ, বিশেষত ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর কৌতূহল ছিল তীব্র।

অক্সফোর্ডের পড়া শেষ করে হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষা দিয়ে বসেছিলেন লারউড। বরাবরের মতো সেখানেও তিনি ফার্স্ট। আই. সি. এস. হয়ে তিনি সোজা চলে এলেন ইণ্ডিয়ায়। প্রথমে কিছুদিন ছিলেন দিল্লীতে, পরে সাউথ ইণ্ডিয়া হয়ে চলে এলেন মধ্যপ্রদেশের এই জেলায়। এখানেই জীবনের অনেকগুলো বছর থেকে গেছেন। বলা যায় জীবনের সব চাইতে সেরা অংশটাই এখানে কেটে গেছে তাঁর।

দাদা বা দুই কাকার মতো কোনদিনই আনুষ্ঠানিক ধর্ম পালন করেননি লারউড কিন্তু প্রশাসন চালানোটাকে এক ধরনের ধর্মই মনে করতেন তিনি। সে আমলে সিভিলিয়ানরাই ভারতবর্ষ চালাত। লারউডের কাছে সবার ওপরে ছিল মানুষ, আর মানুষের নিরাপত্তার জন্য যা দরকার সেই রুল অফ ল। দায়িত্ববোধ, নিষ্ঠা, সাধারণ মানুষের প্রতি সহানুভূতি, এ সব তাঁর সুদীর্ঘ কর্মজীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। লারউডের চরিত্রে কিছু কিছু দোষও ছিল (যদি অবশ্য সেগুলোকে দোষ বলা যায়)। তিনি ছিলেন প্রচণ্ড একরোখা, জেদী এবং কখনও কখনও খামখেয়ালীও।

লারউড বিয়ে করেননি। সেই ব্রিটিশ রাজত্বে মধ্যপ্রদেশের এই জেলায় একটি মানুষও যাতে অত্যাচারিত না হয়, সেদিকে তাঁর তীক্ষ্ণ নজর ছিল। দিন নেই রাত নেই ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন লারউড। ঘুরে ঘুরে সবার খবর নিতেন। এই অঞ্চলের শতকরা নব্বুইজনের নাম জানতেন তিনি।

পরাধীন ভারতে সিভিলিয়ানদের প্রতাপ ছিল প্রচণ্ড। মানুষ তাদের

বাঘের মতো ভয় করত। ধমতোরি জেলা এবং শহরের জন্য মনে মনে উডকে ভয় যেমন করত, ভালোওবাসত। তারা বুঝতে কর্মক্ষেত্র—মানুষটি তাদের সত্যিকারের বন্ধু। স্বাধীনতার আগে সেই ফর্টিসেভেনের জুলাইতে লারউড যেদিন এখান থেকে চলে যান সেদিন তাঁকে ধমতোরি জেলার অধিবাসীদের পক্ষ থেকে ফেয়ারওয়েল দেওয়া হয়। বিদায়-সম্বর্ধনায় সেদিন বেশির ভাগ লোকই বালকের মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদেছিল। লারউডের চোখও জলে ভরে গিয়েছিল।

এখানকার লোকেরা বিদায়ের দিন প্রীতি এবং শ্রদ্ধার উপহার হিসেবে লারউডকে দিয়েছিল দামী কাশ্মীরী শাল, পেন-সেট, রিস্টওয়াচ, মলাক্কা বেতের ছড়ি, সোনার আংটি, হীরের বোতাম এবং ইংরেজিতে গীতার অনুবাদ আর একটি বিরাট মানপত্র। সে সব লণ্ডনে নিজেদের বাড়িতে সযত্নে রেখে দিয়েছেন লারউড। রেমিনিসেন্স অফ গোল্ডেন অ্যাণ্ড মেমোরেব্‌ল পাস্ট। ফেয়ারওয়েলের পর কয়েক হাজার লোক চোখের জলে বুক ভাসাতে ভাসাতে স্টেশনে এসে তাঁকে ট্রেনে তুলে দিয়ে গিয়েছিল। বেদনার সঙ্গে মেশানো এই সব সুখের স্মৃতি গভীর আবেগে তিনি একটা সোনার ঝাঁপিতে পুরে রেখেছেন।

দেশে ফিরে গিয়ে কিছুদিন অক্সফোর্ডেই অধ্যাপনা করেছেন লারউড। তারপর কয়েকটা বছর কাটিয়েছেন ইয়র্কশায়ারের নির্জন বাড়িতে বসে দেশ-বিদেশের ইতিহাস আর নৃতত্ত্ব পড়ে। তারপর লণ্ডনে ফিরে ভারত সম্পর্কে একটা বিরাট বই লিখেছেন। সেটা মূলত অটো-বায়োগ্রাফিক্যাল। ভারতে যে দীর্ঘ কয়েক বছর তিনি কাটিয়ে গেছেন সেই অভিজ্ঞতার ওপর বইটা লেখা। বইটা ভালো বিক্রি হয়েছে। যেটা আরো গৌরবের ব্যাপার তা হল, বইটা ওরিয়েণ্টোলজিস্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে। টাইম্‌স লিটারির সাপ্লিমেণ্ট বইটা সম্পর্কে লিখেছে, 'এ পিস অফ রিয়াল ইণ্ডিয়া। হাইলি ইণ্টারেস্টিং অ্যাণ্ড অ্যাবসর্বিং।' কিছুদিন সারা পৃথিবীর ওয়াইল্ড লাইফ প্রিজার্ভেসন নিয়ে মেতেছিলেন। এ ব্যাপারে ইওরোপ, আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়ায় বেশ

কয়েক বছর কাটিয়েছেন।

নানা ধরনের এত সব কাজকর্মের মধ্যেও ভারতবর্ষকে ভুলতে পারেননি লারউড। জীবনের সেরা কয়েকটা বছর তিনি জন্মভূমি থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে ইস্টার্ন হেমিস্ফিয়ারের ঐ দেশটিতে কাটিয়ে এসেছেন। ইণ্ডিয়া তাঁর দ্বিতীয় হোমল্যাণ্ড। পৃথিবীর নানা জায়গায় ঘুরে বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকলেও বরাবর ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহলটা তীব্র। লণ্ডনে যখন থাকেন তখন সময় পেলেই চলে যান ইণ্ডিয়া হাউসে। ওখানে এ দেশের যাবতীয় পত্র-পত্রিকা যায়। কাগজপত্র কিংবা ইণ্ডিয়া হাউসের লাইব্রেরি থেকে ভারত সম্পর্কে বই-টই পড়ে এ কালের ভারতবর্ষকে বুঝতে চেষ্টা করেন।

এ ছাড়া প্রতি সপ্তাহেই ইণ্ডিয়া থেকে কালচারাল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল বা ট্রেড ডেলিগেশন নিয়মিত লণ্ডনে আসে। আর আসেন মন্ত্রীরা। ডেলিগেশনের মেম্বার বা মন্ত্রীদের অনেককেই ভারতবর্ষে থাকার সময় চিনতেন লারউড। তাঁরাও তাঁকে মনে করে রেখেছেন। লণ্ডনে এসে প্রচুর ব্যস্ততার মধ্যে দেখা করতে না পারলেও ওঁদের অনেকেই একটা করে ফোন অন্তত করেন। প্রবল আগ্রহে আজকের ভারত সম্পর্কে তাঁদের কাছে নানা প্রশ্ন করে যান লারউড। তা ছাড়া ইণ্ডিয়ায় তাঁর কম বন্ধুবান্ধব নেই। মাঝে মাঝে তাঁদের কাছে চিঠি লেখেন। তবে ইণ্ডিয়া থেকে চলে যাবার পর প্রথম প্রথম যে অজস্র চিঠি লিখতেন এখন সেটা অনেক কমে গেছে।

সাতষট্টি-আটষট্টির মতো বয়স লারউডের। লারউড পরিবারের বেশির ভাগ মানুষ দীর্ঘজীবী। তাঁদের গড় আয়ু আশী বছর। মোটামুটি এই আয়ুটাও যদি তিনি পান তবে এখনও বেশ কয়েকটা বছর তিনি এই পৃথিবীতে আছেন। তবু এটা তো ঠিক, জীবনের লম্বা দৌড় অনেকটাই শেষ করে এনেছেন। কিছুদিন ধরেই তাঁর খুব ইচ্ছা হচ্ছিল, ভারতবর্ষটা আরেকবার দেখে আসবেন। সাতাশ বছর আগে পরাধীন ভারত থেকে তিনি চলে গিয়েছিলেন। স্বাধীনতার সাতাশ বছর পর

সেই দেশ এখন কেমন চেহারা নিয়েছে, সেটা দেখার জন্য মনে মনে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। ইণ্ডিয়া তাঁর স্বদেশ না হলেও কর্মক্ষেত্র— তাঁর দ্বিতীয় হোম। যদিও কাগজ-টাগজ বা বই পড়ে কিংবা নানা লোকের মুখে শুনে স্বাধীন ভারত সম্পর্কে অনেক খবরই জেনেছেন লারউড তবু নিজের চোখে দেখা আর পরের কাছে শোনার মধ্যে তফাত অনেক

৫

দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়ার পর একটু শুয়েছিলেন লারউড। কাল রাত্তিরে ট্রেনে ভালো ঘুম হয়নি। নারায়ণদাস শুক্লাদের এই বিশাল ঘরখানায় প্রচুর আলো আর হাওয়ায় গা ডুবিয়ে প্রকাণ্ড মকরমুখী খাটটায় শুয়ে থাকতে থাকতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন খেয়াল নেই। ট্রপিক্যাল কান্ট্রির আবহাওয়ার কাণ্ডকারখানাই এই রকম। মানুষকে অলস করে তোলে।

ঘুম যখন ভাঙল, বেলা হেলে গেছে। পশ্চিমের ঢালু পাড় ধরে গড়াতে গড়াতে সূর্যটা অনেক নিচে নেমে গেছে। রোদের রং তখন বালি হলুদ।

আস্তে আস্তে উঠে বাথরুমে চলে গেলেন লারউড। মিনিট কয়েক পর ফিরে এসে দেখলেন নারায়ণদাস আর মাধুরী চায়ের সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে বসে আছে। এ বেলা দুর্গাবতী আর বিনায়ককে দেখা গেল না।

নারায়ণদাস বললেন, 'খুব ঘুমিয়েছেন। আমরা এসে আরও দু-তিনবার ঘুরে গেছি। নিন, চা খান—'

লারউড হাসলেন, 'হ্যাঁ, খবরের কাগজ পড়তে পড়তে কখন যে ঘুমটা এসে গেল। তবে ভালোই লাগছে। শরীর বেশ ঝরঝরে হয়ে গেছে।'

শুধু চা-ই না, তার সঙ্গে ঘরে তৈরি নানারকম খাবারও নিয়ে এসেছেন মাধুরী। বোঝা যাচ্ছিল লারউডের দেখাশুনা এবং খাওয়ানোর

দায়িত্বটা তিনিই নিয়েছেন।

লারউড শুধু চায়ের কাপটাই তুলে নিলেন। খাবার-দাবার ছুঁলেন না। অবেলায় দুপুরের খাবার খাওয়া হয়েছিল, এখনও পেটটা ভার হয়ে আছে।

মাধুরী কিছু একটু খাবার জন্য বার বার বলতে লাগল। অন্তত একটা পেঁড়া কিংবা একটু মতিচুর বা খানিকটা সেঁকা পাঁপর। লারউড জানালেন, 'এখন খেলে খুব কষ্ট হবে। রাত্তিরে আর খেতে পারব না।'

মাধুরী আর জোর করলেন না।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে লারউড বললেন, 'চমৎকার।' চায়ের ব্যাপারে তাঁর খুঁতখুঁতুনি আছে। ও বেলাতেই তিনি মাধুরীকে বলেছিলেন, দুধমেশানো চা তাঁর পছন্দ না। লিকারটা কড়া হবে, আর চিনি মাত্র এক চামচ। এই বয়সেও তাঁর ব্লাড প্রেসার নরম্যাল; রক্তে সুগারের পরিমাণ স্বাভাবিক।

মাধুরী তাঁর মনের মতো চা-ই করে দিয়েছেন।

চা খাবার পর লারউড বললেন, 'আমি একটু বেরুব শুক্লাজী

নারায়ণদাস বললেন, 'কোথায় যাবেন?'

ডেফিনিট কোন জায়গা নেই। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরব। শহরটা দেখতেও খুব ইচ্ছে করছে। তাতে হাঁটাও হবে। আর শহর দেখাও হবে। ডাক্তার দিনে আমাকে মিনিমাম চার মাইল হাঁটতে বলেছেন। আজ একশো গজও হাঁটা হয়নি।' বলতে বলতে উঠে পড়লেন লারউড, 'চলুন, আপনিও হেঁটে আসবেন—'

নারায়ণদাস মুখ কাচুমাচু করে জানালেন, বছর দশেক ধরে হাঁটু এবং শরীরের যাবতীয় গাঁটগুলো বাতের দখলে চলে গেছে। একদিন হাঁটলে তিনদিন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবেন না।

লারউড হাসতে হাসতে বললেন, 'সত্যি সত্যিই ওল্ড ম্যান হয়ে গেলেন।'

নারায়ণদাস হাসতে লাগলেন।

লারউড বললেন, 'রিউম্যাটিজমের কাছে সারেণ্ডার করে আপনি ঘরে বসে থাকুন। আমি বেরিয়ে পড়ছি।' একটু থেমে পরমুহূর্তে বলে উঠলেন, 'এবেলা বিনায়ককে তো দেখছি না।'

'তুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর বেরিয়ে গেছে।' নারায়ণদাস বললেন।

'একা একা ঘুরব। একজন সঙ্গী পেলে গল্প করতে করতে হাঁটা যেত।' বলতে বলতে মাধুরীর দিকে ফিরলেন লারউড। কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে বললেন, 'তুমি বেড়াতে যাবে নাকি বৌমা ?'

'মাধুরী উত্তর দেবার আগেই নারায়ণদাস খুব ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন, 'ওকে যদি পারেন নিয়ে যান স্যার, বিনোদ চলে যাবার পর মেয়েটা বাড়ি থেকে একদিনও বেরোয়নি।' একটু থেমে আবার বললেন, 'মুখটা সব সময় করুণ করে বসে থাকে। ওর দিকে তাকানো যায় না। কত বলি একটু ঘুরে এসো। নিয়েও যেতে চাই কিন্তু ও বেরুতেই চায় না।'

মাধুরীর বিষণ্ণ করুণ মুখ দেখে প্রথম থেকেই মায়া পড়ে গিয়েছিল লারউডের। গভীর স্নেহের গলায় তাঁকে বললেন, 'চল মা—'

মৃদু স্বরে মাধুরী বললেন, 'আজ থাক চাচাজী, আরেক দিন যাব।'

লারউড জোর করলেন না। বললেন, 'ঠিক আছে। আরেক দিনই যেও। যেতে হবে কিন্তু—' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

নারায়ণদাস আর মাধুরী বাড়ির সামনের দিকের সেই বিরাট বিরাট সিঁড়িগুলো পর্যন্ত এলেন। লারউড যখন সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামতে যাবেন হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল নারায়ণদাসের। উদ্বিগ্ন মুখে বললেন, 'স্যার, একটু সাবধানে চলাফেরা করবেন আর বেশি রাত করবেন না। তাড়াতাড়িই ফিরে আসবেন।'

লারউড একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন বলুন তো ?'

'মানে ঐ বুধোয়ারিটা—'

লারউড জোরে জোরে বেশ শব্দ করেই হেসে উঠলেন, 'আই সী। ঐ বদমাশ ছুঁচোটার তুশ্চিন্তা দেখছি আপনার মাথা থেকে যায়নি।'

নারায়ণদাস বললেন, 'আপনি স্যার জানেন না ও কী টাইপের ছেলে!'

লারউড বললেন, 'বুধোয়ারিও ঠিক জানে না আমি কী টাইপের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ছিলাম।'

নারায়ণদাস বললেন, 'আমি বরং আপনার সঙ্গে যাই।'

'একটা অ্যান্টি-সোসাল বজ্জাতকে এত ভয় পেতে নেই। তাতে ওদের আশকারা দেওয়া হবে। প্লীজ, আমার সঙ্গে কষ্ট করে আপনাকে আসতে হবে না।' বলে লারউড আর দাঁড়ালেন না। উঁচু উঁচু সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামতে লাগলেন আর নারায়ণদাসবা সিঁড়ির মাথায় বিরাট বিরাট থামওলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকলেন।

একটু পর বাড়ির সামনের প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ড পেরিয়ে লারউড বাইরের রাস্তায় চলে এলেন। আর তখনই ভোলার গলা তাঁর কানে ভেসে এলো, 'হুজৌর —'

অন্যমনস্ক হাঁটছিলেন লারউড। ঘাড় ফেরাতেই দেখতে পেলেন, একটু দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভোলা। লারউড জিজ্ঞেস করলেন, 'কি রে, তুই এখানে?'

'আপনার ইন্তেজার করছি হুজৌর—'

'কেন রে?'

ভোলা যা উত্তর দিল তা এই রকম। যে ক'দিন লারউড এখানে আছেন সে আর টাঙ্গায় সওয়ারী তুলবে না। সকাল থেকে হুজুরের জন্য এখানে এসে দাঁড়িয়ে থাকবে। হুজুরের যখন যেখানে যাওয়া দরকার সে পৌঁছে দেবে।

লারউড বললেন, 'তুই কি পাগল হয়ে গেলি ভোলা!'

ভোলা বলল, 'হুজৌব মা-বাপ, একদিন আপনি আমার জান বাঁচিয়েছিলেন। এটুকু না করতে দিলে আমার বহোত দুখ হবে।' একটু চুপ করে থেকে হাত জোড় করে বলল, 'স্রিফ এই কিরপাটুকু করুন।'

লারউড বুঝতে পারছিলেন, এইভাবেই ভোলা তার ঋণের কিছুটা শোধ করতে চায়। বললেন, 'এতে যে তোর অনেক লোকশান হয়ে যাবে ভোলা।'

ভোলা হাতজোড় করে বলল, 'কোন লুকসান হবে না বড়ে সরকার। আপনি কির্‌পা করে থোড়েসে সেবা করতে হুকুম দিন।'

লারউড বললেন, 'কিন্তু আমার টাঙ্গার দরকার নেই যে। তুই তো জানিস, আমার হেঁটে বেড়াতে ভালো লাগে।'

'জানি হুজৌর। তবু নৌকর টাঙ্গা নিয়ে রোজ হাজির থাকবে।'

ভোলাটা একেবারে নাছোড়বান্দা। কবে তার জন্য কী করেছিলেন, সেটা এতকাল পরও ভুলে যায়নি। হাল ছেড়ে দিয়ে লারউড বললেন, 'ঠিক আছে, লোকসান করার জন্যে যখন ক্ষেপেই উঠেছিস তখন আমাকে মার্কেটের কাছটায় নামিয়ে দিয়ে যা।' বলেই টাঙ্গায় উঠে পড়লেন।

হাতে যেন আকাশের চাঁদ পেয়ে গেল ভোলা। বলল, 'জী সরকার।'

মিনিট কয়েক পর ধমতোরি শহরের মাঝমধ্যিখানে বড় মার্কেটে এসে পড়লেন লারউড। এই জায়গাটা এ শহরের সবচাইতে জমজমাট পাড়া। বড় বড় দোকান, শো-উইণ্ডো, শপিং সেণ্টার, সিনেমা হল, রেস্তোরাঁ, সেলুন, এমনি অনেক কিছু দিয়ে সাজানো। সাতাশ বছর আগে যা দেখে গিয়েছিলেন তার তুলনায় জায়গাটার জলুস কয়েকগুণ বেড়ে গেছে। চারপাশে ঝকঝকে বিরাট বিরাট সব বাড়ি উঠেছে। সিনেমা হল থেকে মাইকে খুব সমারোহ করে চটকদার হিন্দী গানের রেকর্ড বাজানো হচ্ছে। ইভনিং শোয়ের আর বেশি দেরি নেই। তার আগে মাইকে গান বাজিয়ে লোক টানার ব্যবস্থা। সাতাশ বছর আগেও এই কায়দা দেখে গেছেন লারউড। সেই ট্রাডিসন এখনও চলছে।

মার্কেটের ভেতর আসার পর টাঙ্গা থামিয়ে নেমে পড়লেন লারউড। ভোলাকে বললেন, 'তুই চলে যা। আমি এবার একটু হেঁটে হেঁটে চারদিকটা দেখি।'

ভোলা বলল, 'জী—'

ধমতোরি শহরের ওপর এই মুহূর্তে সন্ধ্যা নেমে আসছিল। এখন রোদের ছিটেফোঁটাও নেই, আবার অন্ধকারও তেমন গাঢ় হয়নি। গোটা শহরটা যেন একটা উলঙ্গবাহার শাড়ি গায়ে জড়িয়ে বসে আছে।

মার্কেট এলাকায় এখন দারুণ ভিড়। সবই অচেনা মুখ। তাদের ভেতর দিয়ে হাঁটতে লাগলেন লারউড আর গভীর আগ্রহে চারপাশের লোকজন লক্ষ্য করতে লাগলেন। কিন্তু একটা পরিচিত মুখও চোখে পড়ছে না। নারায়ণদাস, তাঁর স্ত্রী, ভোলা আর ধনেরিলাল ছাড়া তাঁর চেনাজানা আর একজনও কি এ শহরে বেঁচে নেই ? সাতাশ বছরে কম করে দুটো নতুন জেনারেসন এসে গেছে। দুই জেনারেসনের আগের লোকেদের এতকাল বেঁচে থাকাটাই তো আশ্চর্যের ব্যাপার। থাকলেও হয়তো অথর্ব হয়ে বিছানায় পড়ে আছে কিংবা চেহারা এত বদলে গেছে চিনতে পারছেন না। সাতাশ বছর তো কম সময় নয়!

হাঁটতে হাঁটতে এক সময় দি গ্রেট ন্যাশনাল স্টোর্সের সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন লারউড। সাতাশ বছর আগে এটা ছিল ছোট্ট একটা মনিহারী দোকান। এখন চেনাই যায় না। এটাকে অনায়াসেই এখন বিরাট ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর্স বলা যেতে পারে। সৌখিন জামা-কাপড়, রেডিও, রেকর্ড প্লেয়ার, দামী খেলনা, ফ্যাশনেব্‌ল জুতো থেকে বই, ঘর সাজাবার জিনিস, নাম-করা কোম্পানির সেলাই কল, পাখা, স্টীলের আলমারি, এখানে না পাওয়া যায় কি। প্রতিটি জিনিসের জন্য এখানে আলাদা আলাদা সেকসান।

সাতাশ বছর আগে মনিহারী দোকানটা ছিল একটা বাড়ির রাস্তার দিকের একটা ঘরে। সেই বাড়িটা ভেঙেচুরে সেখানে বিরাট তিনতলা বাড়ি তোলা হয়েছে। বাইরে থেকে টের পাওয়া যায়, সমস্ত বাড়ি জুড়েই স্টোরটা।

'দি গ্রেট ন্যাশনাল স্টোর্স' নামটা জানা না থাকলে চিনতেই পারতেন না লারউড। যাই হোক, একদা এই দোকানটার মালিক ছিলেন ছবিলদাসজী, ছবিলদাস শর্মা।

ছবিলদাস ব্রিটিশ আমলে ছিলেন একজন ফার্স্টক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট। অত্যন্ত সৎ, বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান এবং বিবেকবান। জুডিসিয়ারিতে এ জাতীয় মানুষ থাকলে ঐ ডিপার্টমেণ্টের সম্মান বাড়ে। ধমতোরিতে এসেই

ছবিলদাসের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল লারউডের। যদিও ছবিলদাস তাঁর প্রায় সমবয়সী কিন্তু পদমর্যাদায় তাঁর অনেক স্তর নিচে। তবু ছবিলদাসের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছিল। সেটা ঐ ভদ্রলোকের সততা এবং অন্যান্য চারিত্রিক গুণের জন্য।

লারউডের মনে আছে, গান্ধীজী যেবার নন-কোঅপারেশনের ডাক দিলেন সে বছর ব্রিটিশ সরকারের চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন ছবিলদাস। রেজিগনেসন লেটারটা লিখে তিনি প্রথম এসেছিলেন লারউডের কাছে। নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনি কি বলেন স্যার?'

লারউড বলেছিলেন, 'একজন লয়াল ব্রিটিশ অফিসার হিসেবে বলব, এটা প্রচণ্ড অন্যায়, এক ধরনের রাজদ্রোহ।'

ছবিলদাস বলেছিলেন, 'আমি আজ আমার ওপরওলা একজন অনুগত বৃটিশ সিভিলিয়ানের কাছে আসিনি।'

'তবে কার কাছে এসেছেন?'

'স্টিফেন লারউড নামে একজন সেরা মানুষ আর আমার এক পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধুর কাছে এসেছি।'

'সেরা মানুষ আমি নই, তবে আপনার বন্ধু অবশ্যই। বন্ধু হিসেবে বলছি আপনি ঠিক কাজই করেছেন। পরাধীনতার বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ করতে পারে না সে মানুষই না; সারা জীবন তাকে পোকামাকড় বা কৃমিকীট হয়েই থাকতে হয়। আই ওয়েলকাম ইওর ডিসিশন মিস্টার শর্মা। আপনার ওপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল।' বলতে বলতে ছবিলদাসের তু' হাত জড়িয়ে ধরেছিলেন লারউড। একটুক্ষণ ভেবে হঠাৎ সংশয়ের সুরে বলেছিলেন, 'কিন্তু চাকরি ছেড়ে দিচ্ছেন, তারপর চলবে কী করে? আপনার তো অনেক রেসপন্সিবিলিটি।'

ছবিলদাসের চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে। তার ওপর এক বিধবা বোন এবং তু-তিনটি বাচ্চা বাচ্চা ভাগ্নে-ভাগ্নীর দায়িত্ব। সেই জন্যই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন লারউড।

ছবিলদাস বলেছিলেন, 'ভাবছি ব্যবসা-ট্যবসা একটা কিছু করব।'

লারউড বলেছিলেন, 'যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা বলছি। ব্যবসাতে টাকা-পয়সা লাগে। ক্যাপিটালের দরকার হলে আমাকে বলবেন। কোন রকম সঙ্কোচ করবেন না।'

'আমার স্ত্রীর কিছু গয়না আছে। সেগুলো বিক্রি করে দেখি, কি রকম পাওয়া যায়। তারপরও যদি দরকার হয় আপনাকে বলব।'

চাকরি ছেড়েই বৃটিশ গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে প্রোটেস্ট জানিয়েছিলেন ছবিলদাস, নারায়ণদাস শুক্লার মতো পিকেটিং-টিকেটিং করে জেল খাটেননি। ফার্স্টক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট ছবিলদাসের ঐ ধরনের সংগ্রাম করার অভ্যাস ছিল না।

স্ত্রীর গয়না বিক্রি করে এবং লারউডের কাছ থেকে হাজার তিনেক টাকা ধার করে ধমতোরির মার্কেট প্লেসে 'দি গ্রেট ন্যাশনাল স্টোর্স' খুলেছিলেন ছবিলদাস এবং প্রথম দিন লারউডকে দিয়ে উদ্বোধন করিয়েছিলেন। মনে আছে, একজন চাকরি ছেড়ে দেওয়া রাজদ্রোহী ম্যাজিস্ট্রেটের দোকানের ওপেনিং নিয়ে সে আমলে বেশ কিছুদিন গোলমাল চলেছিল। ওপর মহল থেকে লারউডের কাছে কৈফিয়ত চাওয়া হয়েছিল। লারউডের স্লেট অত্যন্ত পরিষ্কার আর সৎ, জবরদস্ত অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বলে তাঁর যথেষ্ট নাম থাকায় শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা চাপা পড়ে যায়।

ছবিলদাসের ব্যবসা প্রথম দিন থেকেই দারুণ চলতে শুরু করেছিল। এ ব্যাপারে লারউডের কিছু হাত ছিল। তখনকার দিনে একজন ব্রিটিশ সিভিলিয়ান কারো সম্বন্ধে আভাস দিলে তাকে পেট্রোনাইজ করতে সবাই বাধ্য হয়। তা ছাড়া চাকরি ছাড়া নিয়ে বেশ ঝামেলা হয়েছিল ছবিলদাসের। লারউড সেটা সামলে দেন। মনে আছে, দোকান খোলার বছর দুই পরেই ধারের টাকাটা শোধ করে দিয়েছিলেন ছবিলদাস।

কতক্ষণ 'দি গ্রেট ন্যাশনাল স্টোর্স'টার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন মনে

নেই। এর মধ্যে চারদিকে আলো জ্বলে উঠেছে। সাতাশ বছর আগে এখানে বিজলী ছিল না ; ডায়নামো চালিয়ে সিনেমা দেখানো হত। কিন্তু এখন ইলেক্‌ট্রিসিটি এসে গেছে।

আলো জ্বলতেই পায়ে পায়ে স্টোর্সটার ভেতর ঢুকে পড়লেন লারউড। খদ্দেরদের ভিড় ঠেলে কাউন্টারে আসতেই সাহেব দেখে একটা ছোকরা সেল্‌সম্যান দৌড়ে এলো। দম-আটকানো গলায় বলল, 'ইয়েস স্যার—'

লারউড বললেন, 'ছবিলদাসজী আছেন ? তাঁর সঙ্গে দেখা করব।'

সেল্‌সম্যান ছোকরাটি বলল, 'উনি তো নেই। ওঁর বড় ছেলে দোতলার অফিসে আছেন, খবর দেব ?'

'না, আমিই যাচ্ছি।' দোতলায় সুদৃশ্য অফিসে এসে ঢুকতেই দেখা গেল বিরাট টেবলের ওধারে গদী-আঁটা আরামদায়ক চেয়ারে রোগা পাতলা চেহারার মধ্যবয়সী একটি লোক বসে আছে। তার মুখে-চোখে ছবিলদাসজীর ছাঁচটি যেন বসানো। পরনে খদ্দর। সেই নন-কোঅপারেশনের বছর থেকেই ছবিলদাসদের বাড়িতে খদ্দরটা চালু হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, এখনও ওটা চলছে।

লারউড মধ্যবয়সীকে বললেন', 'তুমি নিশ্চয়ই ছবিলদাসজীর ছেলে আনন্দী, তাই না ?'

অবাক বিস্ময়ে একজন অপরিচিত বর্ষীয়ান বিদেশীকে দেখতে দেখতে নিজের অজান্তেই উঠে দাঁড়িয়েছিল আনন্দীদাস। আস্তে মাথা হেলিয়ে বলল, 'হ্যাঁ। কিন্তু আপনাকে ঠিক—'

'আমি স্টিফেন লারউড। তোমার বাবা আমার প্রিয় বন্ধু ছিলেন। ছেলেবেলায় তোমাকে দেখেছি।'

অত্যন্ত ব্যস্ত ভাবে টেবিলের ওধার থেকে এধারে এসে লারউডের পা ছুঁয়ে প্রণাম করল আনন্দী। বলল, 'বসুন বসুন, আপনি কবে এখানে এসেছেন ?'

'আজই।' একটা চেয়ারে বসতে বসতে লারউড বললেন।

তাঁর কাছাকাছি অন্য একটা চেয়ারে বসে আনন্দীদাস বলল, 'আমার কম বয়সে আপনি এখান থেকে চলে গিয়েছিলেন। মা-বাবার কাছে আপনার কথা অনেক শুনেছি। ওঁরা দুজনে আপনাকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। বলতেন, আপনার কাছে আমাদের ঋণের শেষ নেই। ঐ দেখুন—' দেওয়ালে টাঙানো একটা পুরনো দিনের ফোটোগ্রাফের দিকে আঙুল বাড়াল সে। ফের বলল, 'চিনতে পারেন?'

ফোটোটা হলুদ হয়ে গেছে। তবু ওখানে যে দুটি মানুষ আছেন তাঁদের সনাক্ত করা যায়। ওঁদের একজন ছবিলদাস শর্মা, আরেকজন স্বয়ং লারউড। বহুকাল আগে এই দোকান খোলার দিন ফোটোগ্রাফার ডাকিয়ে ছবিটা তুলিয়েছিলেন ছবিলদাসজী। কি আশ্চর্য, এত কালের পুরনো ছবি কি যত্ন করেই না ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে!

আনন্দীদাস বলতে লাগল, 'বাবা বলে গেছেন, যতদিন আমাদের শর্মা বংশ থাকবে ততদিন ঐ ছবিও থাকবে।'

লারউডের মতো এককালের কড়া সিভিলিয়ানের চোখেও জল এসে গিয়েছিল। কোন কোন মানুষ এখনও তাহলে তাঁকে মনে করে রেখেছে। বললেন, 'তোমার বাবা একেবারে পাগল। যাক, এখন ছবিলদাসজীর খবর বল—'

বিষণ্ণ গলায় আনন্দীদাস বলল, 'বাবা বছর চারেক আগে মারা গেছেন।'

একটু চুপ করে থেকে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন লারউড। ভারা গলায় বললেন, 'আমি খবর পাইনি। তোমার মা?'

'মা তার আগেই চলে গেছেন। তাও বছর দশেক হল।'

এরপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লারউড আরও জানলেন ওদের ব্যবসা খুব ভালো চলছে। ওরা তিন ভাই ব্যবসা ছাখে। অন্য দুই ভাই মালপত্রের জন্য প্রায় সারা বছরই হয় কলকাতা নয় বম্বে ছোটাছুটি করে। তবে আনন্দীদাস নিজে বেরুতে পারে না। সবাই গেলে এখানকার বিজনেস দেখবে কে? বোনেদের সবার ভালো বিয়ে হয়েছে। ওরা শহরের ভালো

এলাকায় বড় বাড়ি করেছে। আনন্দীদাস বলল, এখানে এসে কোথায় উঠেছেন?'

'নারায়ণদাস শুক্লাজীর বাড়িতে।'

'না না, ওখানে থাকতে হবে না। আমাদের বাড়ি চলে আসুন। আমি গাড়ি পাঠিয়ে মালপত্র আনিয়ে নিচ্ছি। ধমতোরিতে এসে আমাদের বাড়িতে থাকবেন না, এটা আমরা ভাবতে পারি না।'

লারউড বললেন, 'গাড়ি পাঠিও না। সবে এসেছি, আজই ওখান থেকে চলে এলে খুব খারাপ দেখাবে। আমি তো এখন কিছুদিন থাকছিই। ফিরে যাবার আগে তোমাদের বাড়িতে দু-একদিন থেকে যাব।'

'মোটে দু-একদিন!'

আনন্দীদাসের আন্তরিকতা বড় ভালো লাগছিল লারউডের। ভারতবর্ষের হৃদয় তাহলে তিনি ছুঁতে পেরেছেন। নইলে এত কাল পর কেন এরা তাঁকে মনে করে রাখবে? হাসতে হাসতে বললেন, 'তোমাদের বাড়িতে আগে যাই। তারপর দেখা যাবেখন। আজ উঠি।'

আনন্দীদাস বলল, 'এখুনি যাবেন, একটু সরবত আর মিষ্টি আনিয়ে দিই।'

'আমি এ সময় কিছু খাই না আনন্দী।'

'বাইরে এসে লারউড দেখলেন অন্ধকার আরও গাঢ় হয়েছে। অবশ্য চারদিকের দোকান এবং বাড়িগুলোতে আলোও জ্বলে উঠেছে। ঝলমলে আলো এবং ভিড়ের ভিতর দিয়ে হাঁটতে লাগলেন তিনি। এ শহরে হঠাৎ একজন অপরিচিত বিদেশীকে দেখে এখানকার লোকজন কৌতূহলী হয়ে উঠছিল। চারপাশ থেকে তারা লারউডকে লক্ষ্য করতে লাগল।

এলোমেলো হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ এক সময় জোরালো বাজনা কানে এলো। সামনের দিকে তাকাতেই লারউডের চোখে পড়ল একটা ব্যাণ্ডপার্টি চটকদার কোন গানের সুর বাজাতে বাজাতে এগিয়ে আসছে। ব্যাণ্ডপার্টির পেছনে একটা সাজানো হাতি। হাওদার

তলায় দুটো লোক। তাদের একজনের হাতে লাউডস্পীকার আর একজনের হাতে গোছা গোছা হ্যাণ্ডবিল।

যে গানের সুরটা বাজানো হচ্ছিল সেটা শেষ হতে হতে ব্যাণ্ডপার্টি এবং হাতি কাছাকাছি এসে পড়ল। আর তখনই হাতির ওপর থেকে লাউডস্পীকার-ওলা লোকটা বলতে লাগল, 'আসছে রবিবার বিকেলে ধমতোরির চক ময়দানে বিরাট জনসভা। এই সভায় দেশসেবক বিন্ধ্যাচলী সিংজী আপনাদের কাছে দিল্লীর লোকসভায় যাবার জন্যে ভোট চাইবেন। কৃপা করে আপনারা দলে দলে যোগ দিন।' তার বলা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা লোক গোছা গোছা ছাপানো হ্যাণ্ডবিল চারদিকে হরির লুটের মতো ছড়াতে লাগল।

এদিকে হাতি আর ব্যাণ্ডপার্টি দেখে মার্কেটের সব লোক দৌড়ে এসেছে। তারা হ্যাণ্ডবিল কুড়োতে লাগল। হাওয়ায় উড়তে উড়তে একটা হ্যাণ্ডবিল লারউডের দিকে আসছিল। হাত বাড়িয়ে তিনি সেটা ধরে ফেললেন।

হ্যাণ্ডবিলটার মাঝখানে বিন্ধ্যাচলী সিং-এর ছবি। তার নিচে হিন্দীতে আবেদন রয়েছে। বয়ানটা এইরকম—বিন্ধ্যাচলী সিং স্বাধীন ভারতে দেশের এবং মানুষের সেবা করতে চান। সেজন্য তিনি সবার কাছে ভোট প্রার্থনা করছেন। ইত্যাদি ইত্যাদি।

সাতাশ বছর আগে ধমতোরিতে থাকার সময় হিন্দী শিখেছিলেন লারউড। হ্যাণ্ডবিলটা পড়ার পর কিছুক্ষণ থ হয়ে রইলেন। যদিও আগেই নারায়ণদাস জানিয়েছিলেন বিন্ধ্যাচলী সিং জনসাধারণের প্রতিনিধি হয়ে পার্লামেন্টে যেতে চাইছে তবু সে যে এ ভাবে বিপুল সমারোহে ব্যাণ্ডপার্টি বাজিয়ে হাতির পিঠে লাউডস্পীকার বসিয়ে হ্যাণ্ডবিল বিলি করবে, এতটা যেন ভাবতে পারা যায়নি। একটা লম্পট, বজ্জাত এবং আত্যন্ত হারামজাদা জনগণের নেতা হতে চাইছে, লারউডের কাছে এটা সম্পূর্ণ অভাবনীয়।

এক সময় হ্যাণ্ডবিল বিলোবার পর বিন্ধ্যাচলীর ব্যাণ্ডপার্টি আবার

গানের সুর বাজিয়ে চলতে লাগল। তার পেছনে পেছনে হাতিটাও হেলে দুলে রাজকীয় চালে এগিয়ে গেল।

জায়গাটা তিনি চিনতেই পারতেন না, যদি এখানকার চার রাস্তার মাঝখানে বিরাট ফোয়ারাটা না থাকত। বত্রিশ তেত্রিশ বছর আগে লারউড যখন এখানকার ডি. এম. শহরের এই দিকটা ছিল ফাঁকা পাথুরের মাঠ। তিনিই এখানে রাস্তাঘাট বানিয়ে ধমতোরি শহরকে অনেকটা বাড়িয়ে যান। লারউড বুঝতে পেরেছিলেন, এই শহরে লোকজন দ্রুত বাড়তে থাকবে। ভবিষ্যতের কথা ভেবেই তিনি ধমতোরিকে বাড়াবার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। এই নতুন অঞ্চলের নামও তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন, নিউ কলোনি।

আগে এখানে বাড়ি-ঘর খুব একটা ছিল না। সাতচল্লিশের জুলাই মাসে লারউড যখন এখান থেকে চলে যান তখন সবসুদ্দু পঞ্চাশ-ষাটটার বেশি বাড়ি তৈরি হয়নি। আসলে কেউ এদিকটায় তখন আসতেই চাইত না। লারউডই অনেককে বলে-কয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বাড়ি করিয়েছিলেন।

এখন চৌরাস্তায় গেলে ফোয়ারাটার চারপাশ দিয়ে টাঙ্গা, সাইকেল রিক্‌শা এবং অল্পস্বল্প প্রাইভেট কার অনবরত ছুটছে। আর আছে অগুণতি মানুষ।

এখানেও রয়েছে প্রচুর দোকান-পাট, শপিং সেন্টার। রাস্তার এক-ধারে দাঁড়িয়ে নিউ কলোনির চেহারা দেখে ভীষণ ভালো লাগল লারউডের। বত্রিশ-তেত্রিশ বছর আগে তাঁর নিজের হাতে-গড়া এই নতুন শহর যে এত ঝকমকে এত জমকালো হয়ে উঠবে, কে ভাবতে পেরেছিল। ইণ্ডিয়াতে না এলে এটা তাঁর জানা হত না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চারপাশের লোকজন, গাড়ি ঘোড়া ইত্যাদি দেখতে দেখতে হঠাৎ রাহুলজীর কথা মনে পড়ে গেল লারউডের। রাহুলজী ছিলেন এখানকার হাই স্কুলের হেড মাস্টার। লারউডের ডাকে তিনিই প্রথম নিউ কলোনিতে এসে বাড়ি করেছিলেন।

রাহুলজীর বাড়িটা পরিষ্কার মনে আছে। লারউড এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখান থেকে ডানদিকের রাস্তায় মিনিট দুই হাঁটলেই অন্য একটা রাস্তার মোড়ে রাহুলজীর বাড়ি। লারউডের খুব ইচ্ছা হল, এত কাছে যখন এসেই পড়েছেন তখন একবার ওখানে যান। প্রবল এক আকর্ষণ এক টানে লারউডকে দু' মিনিটের মধ্যে রাহুলজীর বাড়ির সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিল।

ধমতোরি শহরে অনেক কিছুই বদলে গেছে কিন্তু রাহুলজীর একতলা বাড়িটা ত্রিশ-বত্রিশ বছর আগে যেমন ছিল প্রায় তেমনই আছে। বরং বলা যায়, সেটার হাল এখন খুবই খারাপ। দেয়াল থেকে পলেস্তারা খসে খসে ইট বেরিয়ে পড়েছে। বছরের পর বছর বর্ষায় ভিজে ভিজে শ্যাওলার পুরু স্তর পড়েছে ইটের গায়ে। ছোট ছোট অশ্বত্থের চারা শিকড় চালিয়ে ধ্বংসের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। বাইরে থেকে মনেই হয় না, ভেতরে কোন মানুষ রয়েছে।

সদর দরজার কাছে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন লারউড। হঠাৎ তাঁর মনে হল, এতদিন পর রাহুলজী কি আর বেঁচে আছেন? তবু যখন এসেই পড়েছেন, একবার দেখেই যাওয়া যাক। হাত বাড়িয়ে দ্বিধান্বিতের মতো তিনি আস্তে আস্তে কড়া নাড়াতে লাগলেন।

একটু পর খুট করে দরজা খুলে একটি তেইশ-চব্বিশ বছরের মেয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। তার দিকে তাকিয়ে চোখ দুটো জুড়িয়ে গেল লারউডের। গায়ের রঙ আশ্বিনের রৌদ্রঝলকের মতো। ঘন পালকে ঘেরা বড় বড় স্নিগ্ধ চোখ। পানপাতার মতো মুখ। সরু চিবুক, গলাটা যেন সোনার ফুলদানি। ছোট্ট কপালের ওপর থেকে কোঁচকানো কোঁচকানো ঘন চুলের ঘের। পরনে আটপৌরে ছাপা শাড়ি আর মেরুন রঙের ব্লাউজ। গয়না বলতে কানে একজোড়া দুল আর গলায় ফিনফিনে সরু হার। তাতেই মেয়েটাকে অলৌকিক মনে হচ্ছে।

লারউড জিজ্ঞেস করলেন, 'রাহুলজী বাড়ি আছেন?'

মুখোমুখি একজন বিদেশীকে দেখে হকচকিয়ে গিয়েছিল মেয়েটি।

তার ওপর লারউডের মুখে পরিষ্কার নির্ভুল হিন্দী শুনে সে অবাকও হল। বলল, 'আছেন।' এক পলক ভেবে বলল, 'ভেতরে আসুন—'

মেয়েটির পিছন পিছন বাড়ির মধ্যে চলে এলেন লারউড। ভেতরের বড় বারান্দায় একটা কম পাওয়ারের আলো জ্বলছিল। বারান্দার একদিকে তিনটে শোবার ঘর। উল্টোদিকে বাথরুম কিচেন খাবার ঘর। সবই লারউডের চেনা।

যেতে যেতে লারউড জিজ্ঞেস করলেন, 'রাহুলজী তোমার কে হন?'

মেয়েটি বলল, 'পিতাজী।'

'তোমার নাম কি?'

'সুষমা।'

তোমাকে আমি দেখে যাইনি। আমি যখন চলে যাই তুমি তখন হওনি। তোমার দাদা সিদ্ধার্থকে দেখে গেছি।'

লারউড সম্বন্ধে সুষমার বিস্ময় বাড়ছিল। ঘাড় ফিরিয়ে একবার সে তাঁকে দেখে নিল।

কথা বলতে বলতে ওরা ডানদিকের বড় ঘরটার কাছে চলে এলো। সুষমা বলল, 'আসুন, পিতাজী এ ঘরেই আছেন।'

ভেতরে ঢুকতেই চোখে পড়ল ঘরের সিলিং থেকে একটা বাল্ব ঝুলছে। তার আলোতে দেখা গেল, একধারে পুরনো আমলের কারু-কাজ-করা একটা প্রকাণ্ড খাটে রুগ্ন পঙ্গু প্রায়-কঙ্কালসার একটি বৃদ্ধ বিছানার সঙ্গে লেগে শুয়ে আছেন। তাঁকে দেখতে দেখতে চমকে উঠলেন লারউড। ইনিই যে ত্রিশ-বত্রিশ বছর আগে একজন তাজা টগবগে স্বাস্থ্যবান প্রাণবন্ত মানুষ ছিলেন, তা যেন ভাবাই যায় না। অন্য কোথাও তাঁকে দেখলে চিনতেই পারতেন না লারউড।

বালিশের ওপর থেকে মাথাটা খানিক উঁচু করে দুর্বল গলায় রাহুলজী বললেন, 'কে—আপনি?'

লারউড বিছানার দিকে এগিয়ে এলেন, 'আমি—আমি স্টিফেন লারউড।'

হাতের ওপর ভর দিয়ে অত্যন্ত ব্যস্তভাবে উঠে বসতে চাইলেন রাহুলজী। লারউডকে তিনি চিনতে পেরেছেন। বললেন, 'স্যার, আপনি —আপনি এতদিন পরে আমার বাড়ি এসেছেন! কী সৌভাগ্য আমার!'

লারউড তাঁকে উঠতে দিলেন না। দুই কাঁধে দুই হাত রেখে ফের শুইয়ে দিতে দিতে বললেন, 'আপনি শুয়ে থাকুন। আমি পাশে বসছি। বিছানারই একধারে বসতে বসতে বললেন, 'এ কী হাল হয়েছে আপনার! সেই ব্রাইট লাইভ্‌লি ভিগোরাস টিচারকে এভাবে দেখব ভাবতেই পারিনি।'

'দু-দুটো স্ট্রোক হয়ে গেছে। ডাক্তার আর সুষমা আমাকে আর বিছানা থেকে নামতে দেয় না। কিন্তু স্যার, রোগীর বিছানায় আপনার বসে থাকা ঠিক হবে না।' লারউডের সঙ্গে কথা বলতে বলতে মেয়ের দিকে ফিরলেন রাহুলজী, 'স্যারকে প্রণাম কর। তারপর ওঘর থেকে বড় চেয়ারটা এনে দে।'

লারউড বার বার বললেন, চেয়ারের প্রয়োজন নেই, তবু কে কার কথা শোনে। সুষমা তাঁকে প্রণাম করল এবং পাশের ঘর থেকে চেয়ার নিয়ে এলো। লারউডকে সেখানে বসতে হল।

এবার রাহুলজী তাঁর দুর্বল ক্ষীণ গলায় চেঁচামেচি জুড়ে দিলেন। মেয়েকে বললেন, 'আমাদের বাড়ি কে এসেছেন তুই জানিস সুষমা! শীগগির চা আর মেঠাই নিয়ে আয়—'

হাতজোড় করে লারউড বললেন, তার কোন কিছু দরকার নেই। শুধু এক কাপ বিনা-দুধ চা হলেই চলবে। আর যেভাবে রাহুলজী উত্তেজিত হয়ে উঠছেন, সেটা তাঁর শরীরের পক্ষে ভয়ানক ক্ষতিকর। কিন্তু কোন কথাই শুনলেন না রাহুলজী। সুষমাকে দিয়ে খাবার এবং চা আনিয়ে এক রকম জোর করেই লারউডকে খাওয়ালেন। যদিও যখন তখন খাবার অভ্যাস নেই লারউডের, তবু রাহুলজীর স্বাস্থ্যের কথা ভেবে তাঁকে একটু-আধটু খেতেই হল।

খেতে খেতে গল্পও চলছিল। লারউড কোন প্রশ্ন করার আগে খুঁটিয়ে

খুঁটিয়ে তাঁর সম্বন্ধে সব কিছু জেনে নিলেন রাহুলজী। জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে নিজের কর্মস্থলকে যে দেখতে এসেছেন, সে জন্য খুশী হলেন রাহুলজী। ইণ্ডিয়া এবং সেখানকার মানুষজন, বিশেষ করে রাহুলজীকে যে তিনি মনে করে রেখেছেন, সে জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা জানালেন। তাঁর বাড়িতে না উঠে নারায়ণদাসজীদের ওখানে ওঠার জন্য কিছুটা দুঃখ প্রকাশ করলেন। তারপর বললেন, 'আমাদের এখানে কবে খাবেন বলুন। কবে আপনার সুবিধা হবে? যে দিন বলবেন সুষমা আর আমি গিয়ে আপনাকে নারায়ণদাসজীর বাড়ি থেকে নিয়ে আসব।'

লারউড বললেন, 'আপনাকে আর কষ্ট করে যেতে হবে না। আমার সঙ্গে ফর্মালিটির কোন দরকার নেই। ধমতোরিতে যখন এসেছি তখন সুষমার রান্না একদিন খেয়ে যাবই।' একটু ভেবে বললেন, 'আমার কথা তো সবই শুনলেন। এবার আপনার কথা শুনি। ভাবীজীকে তো দেখছি না--'

ওপরের দিকে আঙুল দেখিয়ে রাহুলজী বললেন, 'তিনি স্বর্গে—'

এ বাড়িতে রাহুলজীর স্ত্রীকে না দেখে সেটাই আন্দাজ করেছিলেন লারউড। বিষণ্ণ গলায় বললেন, 'কতদিন হল ভাবীজী চলে গেছেন?'

'বছর দশেক।'

'সিদ্ধার্থকে তো দেখছি না।'

'সে কানাডায়। ভালো রেজাল্ট করেছিল বলে নিজের যথাসর্বস্ব দিয়ে তাকে হায়ার এডুকেশনের জন্য পাঠিয়েছিলাম। সে আমেরিকান মেয়ে বিয়ে করে ওখানকার ন্যাশনালিটি নিয়েছে। আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক নেই।' বলতে বলতে একটু থামলেন রাহুলজী। তারপর আবার বললেন, 'আমার আর বাঁচবার সাধ নেই। নেহাত ঐ সুষমাটার জন্যে মরতে পারছি না। ওর যদি একটা বিয়ে দিতে পারতাম, তাহলেই এই পৃথিবী থেকে আমি পীসফুলি পরম তৃপ্তির সঙ্গে বিদায় নিতে পারতাম।'

লারউড সামান্য ঝুঁকে বললেন, 'কতদূর পড়াশোনা করেছে সুষমা?'

'গত বছর বি. এ. পাস করেছে।'

'ওর মতো সুশ্রী গ্র্যাজুয়েট মেয়ের বিয়ের অসুবিধাটা কোথায়?'

'অসুবিধাটা হল, ওর বাবার টাকা নেই।'

'টাকা নেই! আপনার মতো এত বড় একজন টীচার সারা জীবন তাহলে কী রোজগার করল আর কী জমাল!'

রাহুলজী হাসলেন, 'আমিও তো তাই ভাবি!' দেওয়ালের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললেন, 'ঐগুলো ছাড়া আমার বিশেষ কিছুই নেই।'

দেওয়ালটার দিকে তাকিয়ে লারউড দেখতে পেলেন সেখানে কাচের ফ্রেমে বাঁধানো অজস্র মানপত্র আর সার্টিফিকেট টাঙানো রয়েছে।

চেয়ার ছেড়ে আস্তে আস্তে দেওয়ালটার কাছে এগিয়ে এলেন লারউড। যে মানপত্রগুলো এখানে টাঙানো রয়েছে সেগুলো একজন সৎ আদর্শবান শিক্ষক হিসেবে পেয়েছেন রাহুলজী। নানা প্রতিষ্ঠান এমন কি সরকারের পক্ষ থেকে এই সব মানপত্র তাঁকে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষক হিসেবে রাহুলজী কত মহান কত বিরাট, সে সব কথাই গদগদ আবেগময় ভাষায় এগুলোতে লেখা রয়েছে।

দেখতে দেখতে লারউডের মনে পড়ে গেল, রাহুলজীর মতো টীচার তিনি সারা জীবনে ভাখেননি! শুধু এদেশেই না, ইংলণ্ডেও। ভদ্রলোক কখনও পয়সা নিয়ে টিউশনি করেননি। প্রতিটি ছাত্রের দিকে ছিল তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই বেরিয়ে পড়তেন। এই ধমতোরি শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন। বাড়ি বাড়ি হানা দিয়ে দেখতেন কোন্ ছেলেটা ফাঁকি দিচ্ছে, কোন্ ছেলেটা কোন্ বিষয় বুঝতে পারছে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। স্কুলের ছুটির পরও বাড়ি বাড়ি ঘুরে ছেলেদের পড়াশোনায় সাহায্য করতেন রাহুলজী। স্কুল ছুটির দিন তো কথাই নেই। সেদিন সকালে বেরিয়ে হয়তো বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যেত। দুপুরে কোন ছাত্রের বাড়ি সেদিন খেয়ে নিতেন। বিশেষ করে অ্যানুয়াল পরীক্ষা আর ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষার সময় এই ঘোরাঘুরিটা অনেক বেড়ে যেত। তাঁর সময়ে ধমতোরি ডিস্ট্রিক্ট স্কুল বরাবর ভালো

রেজাল্ট করেছে। প্রতি বছরই তিন-চারটে করে স্কলারশিপ তখন বাঁধা ছিল। যে ক'জনকে ফাইনাল পরীক্ষার জন্য পাঠানো হত, তাদের একজনও কোনবার ফেল করেনি। রাহুলজীর প্রায় সব ছাত্রই পরে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ছাত্রদের দেখতে গিয়ে নিজস্ব এবং পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন রাহুলজী। নিজের সংসারের দিকে কখনো ফিরেও তাকাননি। মাইনের টাকাটা স্ত্রীর হাতে তুলে দিয়েই তাঁর ছুটি। আসলে স্কুল এবং ছাত্র—এই ছিল তাঁর ধ্যান জ্ঞান।

সংসার সম্পর্কে উদাসীন এই রাহুলজীর আচার-আচরণ নিয়ে সব-চাইতে বেশি করে অভিযোগ করার কথা যাঁর সেই মানুষটি, অর্থাৎ রাহুলজীর স্ত্রী রাজলক্ষ্মী কিন্তু হাসিমুখেই স্বামীর সব কিছু মেনে নিয়ে-ছিলেন। শিক্ষাব্রতী আইডিয়ালিস্ট রাহুলজীকে তিনি গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন। মা-পাখি যেমন করে ডানা মেলে তার বাচ্চাদের আগলে রাখে রাজলক্ষ্মী তেমনি নিজের সংসার আর ছেলেপুলেদের ঘিরে রাখতেন। সংসারের কোন আঁচই তিনি স্বামীর গায়ে লাগতে দেননি। রাজলক্ষ্মী নিজের ছোট্ট বাড়ি আর দুটি ছেলেমেয়ের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে মহৎ উদার আদর্শবান স্বামীর জন্য বাইরের বিপুল বিশ্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে সারা জীবন ধরে জাতিগঠনের মূল্যস্বরূপ মানপত্র ছাড়া আর কিছুই পাননি রাহুলজী। এই শেষ বয়সে মেয়ের বিয়ের দুর্ভাবনা নিয়ে পঙ্গু অসুস্থ অবস্থায় এই মানুষটাকে বিছানায় পড়ে থাকতে হবে, এ যেন ভাবা যায় না।

দেওয়ালের কাছ থেকে লারউড ফিরে এসে আবার সেই চেয়ারটায় বসলেন। বললেন, 'হোল লাইফ যে ভালো ভালো ছেলে তৈরি করে একটা নেশানের ভিত বানিয়ে দিলেন তার জন্য এই দেশ কী রিটার্ন দিল? শুধু ঐ ক টা সার্টিফিকেট? আপনার চিকিৎসার জন্যে কী করেছে এই দেশ? পয়সার অভাবে আপনার মেয়ের যে বিয়ে হচ্ছে না, এই কথাটা কি একবারও ভেবেছে?'

রাহুলজী বললেন, 'আপনি তো আমাকে জানেন, সারা জীবন কারো কাছে আমি কিছু চাইনি।'

'জানি। কিন্তু সুষমার বিয়েটা তো দিতে হবে। নিজের শরীরটাও সুস্থ করে তুলতে হবে।'

'কটা ছাত্র পড়িয়েছি বলে গভর্নমেন্ট আমার চিকিৎসা করবে, মেয়ের বিয়ে দেবে, এতটা আমি ভাবি না।'

রাহুলজীর কথায় কি উদাসীনতার সঙ্গে কিছুটা বিদ্রূপও মেশানো রয়েছে! ঠিক বোঝা গেল না। লারউড একটু ভেবে বললেন, 'সুষমার বিয়ের ব্যাপারে কোনরকম চেষ্টা-টেষ্টা করেছেন কি?'

রাহুলজী বললেন, 'সেকেণ্ড স্ট্রোকটা হবার আগে করেছিলাম। অনেক ছেলের বাবার কাছেও গিয়েছি। কিন্তু ঐ একটাই সমস্যা—'

'কি?'

'টাকা। টাকা থাকলে কবেই মেয়েটার বিয়ে হয়ে যেত।' বলতে বলতে একটু থামলেন রাহুলজী। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফের বললেন, সেকেণ্ড স্ট্রোকটা হবার পর পঙ্গু হয়ে দু' মাস ধরে বিছানায় পড়ে আছি। এখন আর কারো বাড়ি যেতে পারি না। খবরের কাগজে পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন দেখে ছেলের খোঁজ পেলে চিঠি লিখি। কোনটার উত্তর আসে, কোনটার আসে না। যাদের উত্তর পাই তাদের প্রচুর ডিমাণ্ড। আমি আর তাদের চিঠি লিখি না।'

'এত বড় দেশে এমন একটা হৃদয়বান উদার মানুষ নেই যে বিনা পণে সুষমাকে নিজের ঘরে নিয়ে যেতে পারে? এ আমি বিশ্বাস করি না।' লারউড বলতে লাগলেন, 'আমি তো কয়েকটা দিন ধমতোরিতে আছি। দেখি তেমন একটা ফ্যামিলি খুঁজে বার করতে পারি কি না। আমার ধারণা পারব।'

বিব্রতভাবে রাহুলজী বললেন, 'এতদিন পর আপনি এলেন। কষ্ট করে এ সব করবেন না।'

'কষ্ট আবার কি! এ তো সামান্য ব্যাপার। আমি যেখানে যেখানে

লটপটে টাউজার্স আর চক্করবক্কর শার্ট, কোমরে নিকেলের কাজ করা চওড়া বেল্ট, গলায় সিল্কের রুমাল বাঁধা—শরীর বাঁকিয়ে চুরিয়ে নানা রকম অঙ্গভঙ্গি করে আসছিল তারা আর মেয়েদের উদ্দেশ্যে দারুণ অশ্লীল ভাবে হাসছিল আর একটানা কুৎসিত মন্তব্য করে যাচ্ছিল।

ওদের পেছনে টাঙ্গায় করে যেতে যেতে ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিলেন লারউড। যত দেখছিলেন ততই বিরক্ত হচ্ছিলেন। সাতাশ-আটাশ বছর আগে এই শহরে মেয়েদের পেছনে এভাবে বদমাস ছোকরাদের লাগার কথা ভাবাই যেত না। আরো একটা ব্যাপার তাঁকে রীতিমত অবাক করে দিচ্ছিল। রাস্তার এই অংশে খুব একটা ভিড়-টিড় না থাকলেও বেশ লোকজন আছে কিন্তু তারা ছোকরাগুলোকে কিছুই বলছে না। বিনা প্রতিবাদে মুখ বুজে চুপচাপ চলে যাচ্ছে। ক'টা অ্যান্টি-সোসাল এলিমেণ্টকে ঠাণ্ডা করে দেবার মতো মানুষ কি এখানে নেই? সবাই কি ভীরু হয়ে গেছে? আজ সকালেও বুধোয়ারি সিং-এর ব্যাপারে এই ভীরুতা চোখে পড়েছিল লারউডের। ছোকরাগুলোকে দেখতে দেখতে সকালবেলার মতোই পুরনো দিনের সেই জবরদস্ত ব্রিটিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর তাঁর রক্তের ভেতর থেকে উঠে এলো যেন। প্রায় চিৎকার করেই তিনি ভোলাকে বললেন, অ্যাই 'টাঙ্গা থামা—'

চমকে ঘাড় ফিরিয়ে ভোলা একপলক লারউডকে লক্ষ্য করল। দেখল লারউডের দৃষ্টি সামনের হারামজাদা ছোকরাগুলোর ওপর স্থির হয়ে আছে; তাঁর চোয়াল ক্রমশ শক্ত হয়ে উঠছে। সকালবেলাও লারউডের এই চেহারা দেখেছে ভোলা। সে বুঝতে পারছিল, লারউড এই ছোকরাদের কিছু বলবেন। ছোকরাগুলোকে ভোলা চেনে। ওরা খুবই বাজে এবং বিপজ্জনক। ওদের বিরুদ্ধে খুনজখম থেকে শুরু করে ছিনতাই রাহাজানি এবং ধর্ষণের গণ্ডা গণ্ডা মামলা রয়েছে। সে ভয়ে ভয়ে বলল, 'এখানে গাড়ি থামিয়ে কী হবে? অনেক রাত হয়ে গেছে। আপনাকে জলদি শুক্লাজীর মোকানে পৌঁছে দিচ্ছি।'

লারউড ধমকে উঠলেন, 'যা বলছি তাই কর।'

লারউডের মধ্যে এখন এমন এক ব্যক্তিত্ব যাতে ভোলাকে টাঙ্গা থামাতেই হল। ভীত স্বরে সে বলল, 'বড়ে সরকার, ঐ ছোকরাগুলো বহোত খতরনাক।'

লারউড মজা করার ভঙ্গিতে বলে উঠলেন, 'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। ওদের নামে বহোত ভারী ভারী কেস আছে। লেকেন কিছুই হয় না।'

'আচ্ছা।'

'তা ছাড়া ওরা বিন্ধ্যাচলী সিং-এর আদমী। তার হয়ে ভোটে খাটছে। ওদের ছুঁতে কেউ সাহস করে না।'

এখানেও বিন্ধ্যাচলী! লারউড উত্তর দিলেন না। এক লাফে টাঙ্গা থেকে নেমে সেই ছোকরাগুলোর কাছে দৌড়ে গিয়ে চিৎকার করে বললেন, 'উল্লু রাসকেল, এত বড় সাহস যে আমার সামনে মেয়েদের বিরক্ত করছ!'

ছোকরাগুলো হকচকিয়ে গিয়েছিল। একজন সাড়ে ছ ফুট লম্বা উত্তেজিত সাদা চামড়ার সাহেবকে এভাবে তাড়া করে আসতে দেখে ওরা কয়েক পা পিছিয়ে গিয়েছিল। আসলে এমন করে তারা কাউকে রুখে দাঁড়াতে দ্যাখেনি। এটা তাদের অভিজ্ঞতার বাইরে।

লারউড আবার চেঁচিয়ে বললেন, 'জানোয়ারের দল, চাবকে তোমাদের আমি সিধে করে দেব।'

ইতিমধ্যে প্রাথমিক বিস্ময় এবং ভয়টা কাটিয়ে নিয়েছিল ছোকরা-গুলো। এবার তারা রুখে দাঁড়াল। একটা ছোকরা বলল, 'কৌন্ লাট-সাহাব হো তুম চাবুকমারনেবালা। শালে ফরেনার— ' বলেই সে এগিয়ে আসতে লাগল। তার পেছনে অন্য ছোকরারা পায়ে পায়ে আসছে।

ছোকরার কথাগুলো শুনতে শুনতে মাথার ভেতর বিস্ফোরণ ঘটে গেল যেন লারউডের। বুঝতে পারছিলেন ছোকরাগুলো তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। কিন্তু তার আগেই কিছু একটা তাঁকে করতে হবে। লাঠি বেত বা অন্য কোন একটি অস্ত্রের জন্য তিনি ঘুরতেই

দেখলেন ভোলা তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। খারাপ কিছুর আভাস পেয়ে সে টাঙ্গা থেকে নেমে এসেছিল। তার হাতে রয়েছে ঘোড়া হাঁকানোর সেই লিকলিকে চাবুকটা।

ভোলা চাপা ভীরু গলায় বলল, 'চলা আইয়ে বড়ে সরকার—'

লারউড যেন তা শুনতে পেলেন না। ভোলার হাত থেকে চাবুকটা কেড়ে নিয়ে ছোকরাগুলোর ওপর এলোপাতাড়ি চালাতে লাগলেন। তাদের চামড়া এবং মাংসের ওপর একেকটা ঘা কেটে কেটে বসে যেতে লাগল।

ছোকরাগুলো এতটা ভাবতে পারেনি। তারা হঠাৎ ভয় পেয়ে দৌড়তে শুরু করল এবং অনেকটা দূরে অন্ধকারে গিয়ে গোটা কয়েক পাথরের টুকরো ছুঁড়ে পালিয়ে গেল। তার মধ্যে একটা টুকরো এসে লাগল লারউডের কপালে। সঙ্গে সঙ্গে ফিনকি দিয়ে খানিকটা রক্ত বেরিয়ে এলো।

ভোলা রক্ত দেখে চিৎকার করে উঠল, 'হো রামজী, হো শিবশম্ভু, এ ক্যা হুয়া ? উল্লু হারামী লোগ বড়ে সরকারকো খুন নিকাল দিয়া—'

লারউড বললেন, 'চেঁচাস না ভোলা, ও কিছু হয়নি—' বলে পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালে চেপে ধরলেন।

এদিকে রাস্তার লোকজনেরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখছিল। এমন কি যে মেয়েগুলোকে নিয়ে এই ঘটনা তারা এবং তাদের সঙ্গী সেই কুঁজো মতো আধবুড়ো লোকটাও দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ছোকরাগুলো পালিয়ে যাবার পর এবার তারা সবাই এগিয়ে এলো।

মেয়েদের সঙ্গী সেই লোকটা কাছে আসতে মুখটা চেনা চেনা মনে হল। সে ভয়ে প্রায় কাঁপছিল। হাত জোড় করে বলল, 'আপনার জন্যে আজকের ঝামেলা থেকে বাঁচলাম। লেকেন আপনাকে ওরা জখম করে গেল।'

লারউড বললেন, 'আমার জন্যে ভাবতে হবে না। কিন্তু তোমার মুখটা চেনা মনে হচ্ছে। কী নাম বল তো ?'

লোকটা বলল, 'জী হরিপ্রসাদ।' বলে কয়েক পলক তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'আপনি এখানকার ডি. এম. ছিলেন?'

'চিনতে পেরেছ আমাকে?'

অনেকখানি ঝুঁকে হরিপ্রসাদ বলল, 'জী, নমস্তে স্যার। বাবা মারা যাবার পর আপনি আমাকে নকরী দিয়ে জান বাঁচিয়ে ছিলেন।'

লারউডের মনে পড়ল, হরিপ্রসাদের বাবা মাধোপ্রসাদ তাঁর কোর্টে কাজ করত। দুম করে যখন সে মরে যায় তখন সবে ম্যাট্রিকটা পাস করেছে হরিপ্রসাদ। সংসারটা যখন ভেসে যাবার মুখে তখন তিনি ওকে ডাকিয়ে চাকরি দিয়েছিলেন। বললেন, 'এখনও চাকরিটা করছ?'

'করছি হুজৌর।'

'কোন্ ডিপার্টমেন্ট?'

'ল্যাণ্ড রেভিনিউ।'

'হরিপ্রসাদের সঙ্গের মেয়েদের দেখিয়ে লারউড জিজ্ঞেস করলেন, 'এরা কারা?'

হরিপ্রসাদ বলল, 'আমার মেয়ে আর ভাগ্নী।'

'এদের নিয়ে রাত্রিবেলা কোথায় গিয়েছিলে?'

'সিনেমায় স্যার।'

'ঐ বদমাস ছোকরাগুলো পেছনে লেগেছিল কেন?'

'ওরা স্যার মেয়ে দেখলেই পেছনে পড়ে যায়। আজ আমার বাড়ির মেয়েদের পেছনে লেগেছে। কাল আরেকজনের বাড়ির মেয়েদের পেছনে লাগবে।'

'কেউ কিছু বলে না?'

'না। ওরা খুব খতরনাক তা ছাড়া ওদের পেছনে বড় বড় আদমী রয়েছে।'

'এটা মগের মুল্লুক নাকি?'

চারপাশে অন্য যে সব লোক ছিল তারাও জানালো এই হারামী-

গুলোর জ্বালায় মেয়েদের ঘর থেকে বেরুনোই মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। মেয়েদের পেছনে লাগা ছাড়াও ধমতোরির লোকেদের নানাভাবে এই ছোকরারা দিনরাত অতিষ্ঠ করে মারছে।

লারউড জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে থানাটা কোথায় ?'

একজন বলল, 'বেশি দূরে না।' আঙুল বাড়িয়ে ডানদিকের একটা রাস্তা দেখিয়ে দিল, 'ওটার শেষ মাথায়।'

'তোমরা সবাই আমার সঙ্গে চল। এই বজ্জাতি বন্ধ করা দরকার।'

লোকজন কিছু বলবার আগেই চেঁচামেচি জুড়ে দিল ভোলা। বলল, 'সরকার আপনার শির থেকে খুন গিরছে। আমি কিছুতেই এখন আপনাকে থানায় যেতে দেব না।'

লারউড বোঝালেন, আজই এবং এখনই এই বজ্জাত ছোকরাদের ব্যাপারে একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলা দরকার। কিন্তু কোন কথাই শুনল না ভোলা। একরকম জোর করেই লারউডকে টাঙ্গায় তুলে গাড়ি হাঁকিয়ে দিল। পাথুরে রাস্তায় গ্যালপ তুলে ঘোড়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল।

টাঙ্গার ওপর থেকে চিংকার করে লারউড বললেন, 'আমার নাম স্টিফেন লারউড। নারায়ণদাস শুক্লাজীর বাড়িতে আছি। কাল সকালে তোমরা শুক্লাজীর বাড়ি চলে আসবে। আমি তোমাদের থানায় নিয়ে গিয়ে ওই ছোকরাগুলোর বদমাসি বন্ধ করে আসব।'

কিছুক্ষণ পর নারায়ণদাসদের বাড়ি আসতেই লারউডের রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত কপাল দেখে সবাই ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। নারায়ণদাসজী জিজ্ঞেস করলেন, 'এত রক্ত পড়ছে! এ কী কাণ্ড বাধিয়ে এলেন ?'

'লারউড হাসলেন, 'না না, ও কিছু না। এমনি একটু লেগেছে।'

ভোলা সামনেই ছিল। সে আসল ব্যাপারটা বলে দিল।

নারায়ণদাস বললেন, 'সকালবেলা বুধোয়ারীকে নিয়ে ঐ ব্যাপারটা ঘটল, এখন মার্কেটের ঐ বজ্জাতগুলোকে চটিয়ে এলেন। আপনাকে

নিয়ে আর পারা যায় না।' বিনায়ক দাঁড়িয়েছিল। তাকে বললেন, 'এক্ষুনি ডাক্তাব ডেকে আন।'

লারউড বার বার বললেন, 'ডাক্তারের দরকার নেই, একটু আই-ডিন লাগিয়ে দিলে ঠিক হয়ে যাবে', কিন্তু কেউ তাঁর কথা কানেও তুলল না।

একটু পর ডাক্তার এসে কপালে ব্যাণ্ডেজ করে এবং অ্যান্টি-টিটেনাস ইঞ্জেকশান দিয়ে চলে গেল। ভোলা তখনও দাঁড়িয়ে আছে। সে কিছুতেই লারউডকে এ অবস্থায় ফেলে যাবে না। তাকে এক রকম জোর করেই বাড়ি পাঠানো হল। কিন্তু যাবার সময় সে বলে গেল, কাল সকালেই আবার আসছে।

ভোলা চলে যাবার পর লারউডকে দুধ আর খই-টই খাইয়ে তাঁর ঘরে নিয়ে শুইয়ে দেওয়া হল।

দুর্গাবতী, নারায়ণদাস, বিনায়ক এবং মাধুরী, সবাই লারউডের সঙ্গে এ ঘরে এসেছিলেন। দুর্গাবতী বিছানার চারধারে মশারি গুঁজে দিতে দিতে বললেন, 'কাল থেকে রাস্তায় বেরিয়ে কোন দিকে তাকাবেন না। যে যা খুশি করুক, যা খুশি বলুক, আপনার তাতে কোন দরকার নেই।'

লারউড হাসলেন, 'তার মানে আপনি বলছেন বোবা কালা আর অন্ধ সেজে আমি বেড়াতে বেরুব।'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। এতদিন পর এখানে এসেছেন, আমাদের কাছে আছেন, খারাপ কিছু একটা হয়ে গেলে আমরা কারো কাছে মুখ দেখাতে পারব?'

'আপনিই বলুন, কেউ বজ্জাতি করলে মুখ বুজে থাকা যায়!'

'থাকতে হবে। বয়স হয়েছে না? একদিন যে দুর্দান্ত ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন এই কথাটা এখন ভুলে যান তো।'

ছেলেমানুষের মতো হাসতে লাগলেন লারউড। বললেন, 'ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন তখন ভুলেই যাব। ক'দিনের জন্য বেড়াতে এসেছি। ঝঞ্ঝাটে আমার দরকারটা কী?'

নারায়ণদাস বললেন, 'আপনাকে একেবারেই বিশ্বাস নেই। এবার থেকে আপনি যখন বেরুবেন আমরা কেউ না কেউ সঙ্গে থাকব।'

'পাহারাদার?'

দুর্গাবতী বললেন, 'পাহারাদারই আপনার দরকার। এখন আর কথা বলতে হবে না, ঘুমিয়ে পড়ুন।'

আলো নিভিয়ে সবাই বেরিয়ে গেলেন।

৭

আজ সকালবেলা ঘুম ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমেই কাল রাতের সেই বদমাস ছোকরাগুলোর কথা মনে পড়ল লারউডের। যদিও দুর্গাবতীরা বলে রেখেছেন এখানকার কোন আজে বাজে ব্যাপার নিয়ে তাঁকে মাথা ঘামাতে হবে না, তবু কালই তিনি ঠিক করে রেখেছিলেন আজ সকালে হরিপ্রসাদরা এলে তাদের নিয়ে সোজা থানায় চলে যাবেন।

হরিপ্রসাদরা কখন আসবে, ঠিক নেই। তার আগেই তৈরি হয়ে থাকা দরকার। তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেমে বাথরুমে চলে গেলেন তিনি। মুখ-টুখ ধুয়ে ফিরে এসে লারউড দেখলেন মাধুরীরা চা এবং খাবারদাবার সাজিয়ে বসে আছে। শুধু তাঁর জন্যই না, সবার জন্যই চা আর খাবার আনা হয়েছে। বোঝা যাচ্ছে, এ ঘরেই ওদের ব্রেকফাস্টের আসর বসাবার ইচ্ছা।

খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে কথাও চলতে লাগল। মাধুরী জিজ্ঞেস করলেন, 'আজ কেমন আছেন চাচাজী? যন্ত্রণাটা কমেছে?'

লারউড হাসলেন, 'আমার কি এমন হয়েছিল! তোমরাই শুধু শুধু কাল অস্থির হয়ে উঠলে।'

দুর্গাবতী বললেন, 'হেসে উড়িয়ে দিলে কি হবে। কপাল থেকে কতটা রক্ত পড়েছে, হুঁশ আছে আপনার?'

লারউড উত্তর না দিয়ে হাসতেই লাগলেন।

নারায়ণদাস বললেন, 'যাকগে ওসব, কাল বিকেলে বেরিয়েছিলেন, ফিরলেন তো সেই রাত দশটায়। এতটা সময় ঐ ছোকরাদের নিয়েই ছিলেন নাকি?'

'আরে না না, কত জায়গায় ঘুরলাম। আমার পুরনো বন্ধু আর কলীগ ছবিলদাসজীর গ্রেট ন্যাশনাল স্টোর্সে গেলাম—'

'ছবিলদাসজী তো মারা গেছেন।'

'হ্যাঁ। ওর বড় ছেলে আনন্দীর সঙ্গে আলাপ করলাম। খুবই ভালো, আর এণ্টারপ্রাইজিং। বাবার ব্যবসা অনেক বাড়িয়েছে। দেখে আনন্দ হয়।'

'হ্যাঁ। ছবিলদাসের অন্য ছেলেরাও চমৎকার।'

লারউড বললেন, 'ছাবলদাসজীর দোকান থেকে বেরিয়ে রাস্তায় ঘুরছি হঠাৎ দেখি ব্যাণ্ড পার্টি বাজিয়ে হাতিতে চেপে বিন্ধ্যাচলীর লোকেরা তার ইলেকসান মীটিং-এর কথা জানাতে বেরিয়েছে।' বলতে বলতে পকেট হাতড়ে বিন্ধ্যাচলীর ছবিওলা সেই রঙীন হ্যাণ্ডবিলটা বার করে নারায়ণদাসের হাতে দিলেন।

হ্যাণ্ডবিলটা এক পলক দেখে নিয়ে অন্যমনস্কের মতো নারায়ণদাস বললেন, 'এতদিন টাকাপয়সা খরচ করে অন্য লোককে ইলেকসানে জিতিয়েছে বিন্ধ্যাচলী। এবার নিজেই নামছে।'

লারউড বললেন, 'অন্য লোককে খরচ করে ইলেকসান জেতাবার কারণ?'

নারায়ণদাস এবার যা বললেন সংক্ষেপে এইরকম। বিন্ধ্যাচলীর নানারকম গোলমাল আছে। গোলমাল জমি নিয়ে, ব্যবসা-পত্তর নিয়ে, ইনকাম-ট্যাক্স নিয়ে। তাকে বাঁচাবার জন্য গভর্নমেণ্টে ইনফ্লুয়েন্সিয়াল লোক দরকার। সেজন্য অঢেল পয়সা ঢেলে নিজের লোককে নানা ইলেকসান জিতিয়ে মিউনিসিপ্যালিটি, লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি এবং অন্যান্য পাবলিক ইনস্টিটিউশনে এতদিন পাঠিয়ে এসেছে বিন্ধ্যাচলী। এখন সে নিজেই একজন এম.এল.এ. হতে চায়। বিন্ধ্যাচলীর আসল

উদ্দেশ্য হল, রাজনীতিক ক্ষমতা। পলিটিক্যাল পাওয়ারই সব দেশে একমাত্র পাওয়ার।'

লারউড বললেন, 'এতক্ষণে বিন্ধ্যাচলীর ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হল। লোকটা সত্যিই ভীষণ ক্লেভার।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর লারউড আবার বললেন, 'বিন্ধ্যাচলীর হাতি আর ব্যাণ্ডপার্টি চলে যাবার পর গেলাম নিউ কলোনিতে। আমার পুরনো বন্ধু হেডমাস্টার রাহুলজীর সঙ্গে দেখা করলাম।'

নারায়ণদাস বললেন, 'অনেকদিন ওঁর সঙ্গে দেখা হয়নি।'

লারউড বললেন, 'সে কি! এক শহরে থাকেন তবু দেখা হয় না!'

'মানে শহরের ওদিকটায় ঠিক যাওয়া হয়ে ওঠে না। কেমন আছেন রাহুলজী?'

'খুব খারাপ। দুবার হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবার পর বেড-রিড্‌ন হয়ে আছেন।'

'আমি কিছুই জানতাম না। একদিন গিয়ে রাহুলজীকে দেখে আসতে হবে।'

উত্তর দিতে গিয়ে হঠাৎ সুষমার মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল লারউডের। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নজর গিয়ে পড়ল বিনায়কের ওপর। মুহূর্তে একটা সম্ভাবনা ভাবনার ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ-চমকের মতো খেলে গেল। মুখ ফিরিয়ে তিনি বললেন, 'নারায়ণদাসজী, ভাবীজী আর মাধুরী মা, সবার কাছে আমার একটা আরজি আছে।'

দুর্গাবতী বললেন, 'কী আরজি?'

'আমি একটা অনুরোধ করব, সেটা আপনাদের রাখতে হবে।'

'কী অনুরোধ?'

'খারাপ কিছু না। কিন্তু কথা দিন রাখবেন।'

নারায়ণদাস বললেন, 'আমার বিশ্বাস আছে, কোন অন্যায় অসঙ্গত অনুরোধ আপনি করবেন না। কথা দিলাম, এবার বলুন আপনার অনুরোধ কী?'

'আজ না। এখান থেকে যাবার আগে বলব।'

বিনায়ক ওধার থেকে বলে উঠল, 'ক্রাইম স্টোরির মতো আমাদের একটা সাসপেন্সের মধ্যে ঝুলিয়ে রাখছেন কিন্তু—'

লারউড মজা করে বললেন, 'একটু ঝুলেই থাকো। ফলাফল ভালোই হবে। সবুরে মেওয়া ফলে।'

কথায় কথায় বেশ বেলা হয়ে গিয়েছিল। আচমকা লারউডের খেয়াল হল এখনও হরিপ্রসাদের দেখা নেই। তবে কি ওরা আসবে না? না এলেও ঐ ছোকরাগুলোর ব্যাপারে কিছু তো একটা করা দরকার।

এদিকে বেলার চেহারা দেখে মাধুরী আর দুর্গাবতী উঠে পড়লেন। বললেন, 'যাচ্ছি। আর গল্প করলে রান্নাবান্না কিচ্ছু হবে না।'

লারউড মুখ কাচুমাচু করে বললেন, 'ভাবীজী, একটা কথা বলি—'

দুর্গাবতী বললেন, 'কী কথা?'

ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে লারউড বললেন, 'একটু ঘুরে আসতে ইচ্ছে করছে।'

'না, কিছুতেই না। এই শরীর নিয়ে বেরুবার কোন দরকার নেই।' দুর্গাবতী চেঁচামেচি জুড়ে দিলেন। তাঁর সঙ্গে গলা মেলালেন নারায়ণদাসরা।

লারউড বললেন, 'বাড়িতে বসে থাকতে আর ভালো লাগছে না।'

'আচ্ছা, আপনার পায়ের সঙ্গে চাকা বাঁধা আছে?'

'বোধহয়। প্লীজ আর না বলবেন না ভাবীজী।'

অনেক কাকুতি মিনতি শোনার পর দুর্গাবতী বললেন, 'অত করে যখন বলছেন তখন বেরুতে দিতে পারি। তবে একটা শর্ত, বেশিক্ষণ বাইরে থাকতে পারবেন না। এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসতে হবে।'

'অবশ্যই।'

'আর বিনয় আপনার সঙ্গে যাবে।'

'নিশ্চয়ই যাবে। একা-একা ঘুরতাম, একজন কমপেনিয়ান পাওয়া গেল।'

বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাইরের রাস্তায় আসতেই দেখা গেল ভোলা টাঙ্গা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লারউড হেসে ফেললেন, 'নাঃ, তুই দেখছি আমার গায়ে জোঁকের মতো লেগে থাকবি।'

হাত কচলাতে কচলাতে ভোলা বলল, 'টাঙ্গায় উঠুন বড়ে সরকার। কাল মাথায় জখম হয়েছে। আজ আপনাকে পায়দল ঘুরতে দেব না।'

লারউড আর বিনায়ক টাঙ্গায় উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ভোলা ঘোড়া হাঁকিয়ে দিল।

যেতে যেতে লারউড বিনায়ককে বললেন, 'বিনয়, তোমার সঙ্গে একটা জেণ্টলম্যান্‌স এগ্রিমেণ্ট করতে চাই।'

বিনায়ক জিজ্ঞেস করল, 'কিসের এগ্রিমেণ্ট ?'

লারউড যা বললেন, সংক্ষেপে এইরকম। এখন তিনি শুধু বেড়াবার জন্যই বাড়ি থেকে বেরোননি। কাল রাতের সেই বদ ছোকরাগুলো, যারা মেয়েদের পেছনে লেগেছিল এবং প্রতিবাদ করায় পাথর ছুড়ে তাঁর মাথা ফাটিয়েছে, তাদের শায়েস্তা করার জন্যই বেরিয়েছেন। কিন্তু এই কথাটা যেন কোনভাবেই নারায়ণদাস, দুর্গাবতী বা মাধুরী জানতে না পারেন। লারউডের বিশ্বাস, বিনায়ক বাড়ি ফিরে তা বলবে না।

বিনায়ক বলল, 'এতক্ষণে আপনার বেরুবার কারণটা বোঝা গেল। ঠিক আছে, ভদ্রলোকের চুক্তি অনুযায়ী বাড়িতে কিচ্ছু বলব না। তবে এই একটাই ; আর কোন ঝঞ্ঝাটে কিন্তু মাথা গলাতে পারবেন না।'

লারউড বললেন, 'আরে না-না, দু'দিনের জন্যে বেড়াতে এসেছি। অন্য কোন ঝামেলার ভেতর আমি কখনও যাই।'

টাঙ্গাটা অনেকদূর চলে এসেছিল। হঠাৎ লারউডের খেয়াল হল, যে ছোকরাগুলোর বিরুদ্ধে তিনি ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছেন তাদের কাউকেই তিনি চেনেন না। হরিপ্রসাদ বা কাল রাতে রাস্তায় যে সব লোক তাঁর কাছে ছোকরাগুলোর সম্পর্কে অভিযোগ করছিল তারা নিশ্চয়ই ওদের চেনে। কিন্তু হরিপ্রসাদ বা সেই লোকগুলোকে না পেলে

ছোকরাগুলোর নাম ঠিকানা কিছুই জানা যাবে না। আর এ সব না জানলে তাদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থাই বা করা যায়।

লারউডের একবার মনে হল, ভোলা হয়তো ছোকরাগুলোকে চেনে। ভোলাকে সেকথা জিজ্ঞেস করায় ভোলা ঘাড় ফিরিয়ে জানালো, 'চিনি, লেকেন কারো নাম তো জানি না।'

আচমকা লারউডের মনে পড়ে গেল হরিপ্রসাদ ল্যাণ্ড অ্যাণ্ড ল্যাণ্ড রেভিনিউ ডিপার্টমেণ্টে কাজ করে! বৃটিশ আমলে অফিস আর আদালত-টাদালত কোন্ পাড়ায় ছিল, তাঁর মনে আছে। বিনায়কের দিকে ফিরে লারউড জিজ্ঞেস করলেন, 'স্বাধীনতার পর অফিস আদালতগুলো কি পুরনো মহল্লা থেকে সরিয়ে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে?'

বিনায়ক বলল, 'না, সেখানেই আছে।'

লারউড এবার ভোলাকে বললেন, 'অফিস পাড়ায় চল্।'

অফিস মহল্লায় ল্যাণ্ড অ্যাণ্ড ল্যাণ্ড রেভিনিউ ডিপার্টমেণ্ট থেকে হরিপ্রসাদকে খুঁজে বার করতে অসুবিধা হল না। লারউডকে দেখে হকচকিয়ে গেল হরিপ্রসাদ। বলল, 'স্যার আপনি!'

লারউড বললেন, 'সকালবেলা তোদের যাবার কথা ছিল। গেলি না কেন? তোদের জন্যে বসে থেকে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে আসতে হল।'

জড়ানো গলায় হরিপ্রসাদ বলল, 'না মানে—'

'মানে আবার কী?'

'আমার সঙ্গে চল্—'

'কোথায়?'

'কোথায় আবার থানায়।' বলেই একটু থেমে কী ভেবে নিলেন লারউড, পরক্ষণে আবার শুরু করলেন, 'না, থানায় না—এখানকার ডি. এম. কে?'

'নরোনহা সাহেব।'

'ডি. এম-এর কাছেই যাব।'

হঠাৎ হাত জোড় করে হরিপ্রসাদ বলে উঠল, 'আমাকে মাফ করে দিন স্যর, মাফ করে দিন।'

লারউড অবাক হয়ে গেলেন, 'কী হল তোর? কী হল?'

'আমি ডি. এম. সাহেবের কাছে যাব না।'

'কেন?'

প্রথমে উত্তর দিল না হরিপ্রসাদ। অনেক ধমক-টমক দেবার পর সে যা বলল তা হল, ঐ ছোকরাগুলো অত্যন্ত খারাপ ধরনের। ওদের সম্বন্ধে থানায় বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে রিপোর্ট করলে পরে বিপদ হবে। অনেক সময় রাতবিরেতে বেরুতে হয় হরিপ্রসাদকে। হয়তো ছুরিটুরিই মেরে দিল। তাছাড়া ওদের পিছনে রয়েছে অনেক জোরদার খুঁটি। যখনই ধমতোরিতে কোন ইলেকশান হয় তখনই এরা পয়সাওলা ইনফ্লুয়েনসিয়াল ক্যাণ্ডিডেটদের হয়ে খাটে। এবারকার নির্বাচনে ওরা বিন্ধ্যাচলী সিং-এর হয়ে কাজ করছে। পিছনে লোক থাকায় ওদের সাহস এত বেড়ে গেছে যে ওরা যা খুশি তাই করে বেড়াচ্ছে। ওদের নামে থানায় রিপোর্ট করলে কোন লাভ হয় না। পুলিশ হয়তো ধরে গারদে পুরবে কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বিন্ধ্যাচলী সিং কিংবা ঐ রকম আর কেউ জামিন দিয়ে ওদের বার করে নিয়ে যাবে। ওদের নামে কেস করেও কিছু হয় না। কেননা পরে বিপদের ভয়ে কেউ সাক্ষী দেবে না।

লারউড বললেন, 'এই জন্যেই তাহলে তোরা আমার কাছে যাসনি?'

হরিপ্রসাদ মাথা নামিয়ে আস্তে করে বলল, 'হ্যাঁ স্যার—'

'কিন্তু কোন স্টেপ না নিলে ওদের উৎপাত আরও বেড়ে যাবে।'

হরিপ্রসাদ উত্তর দিল না।

লারউড আবার বললেন, 'আয় আমার সঙ্গে। ওদের টিট করার ব্যবস্থা করে দিয়ে যাচ্ছি।'

হরিপ্রসাদের নড়াচড়ার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। ঘাড় নীচু করে সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

লারউড এবার বিরক্ত হলেন, 'কি হল তোর ?'

হরিপ্রসাদ মুখ না তুলে ভীতু গলায় বলল, আর, আপনি তো মোটে কয়েক দিনের জন্য এসেছেন। আপনি যে ক'দিন থাকবেন সে ক'টা দিন ঠিক আছে কিন্তু আপনি যেই চলে যাবেন আমাদের আর ধমতোরিতে থাকতে হবে না। বাড়িঘর ফেলে পালাতে হবে।

লারউড বুঝতে পারছিলেন হরিপ্রসাদের ভয়ের পেছনে যথেষ্টই কারণ আছে। বললেন, 'ঠিক আছে, তোকে যেতে হবে না। কাল যে ছোকরাগুলো বদমাইসি করছিল তাদের নামগুলো শুধু বলে দে--'

হরিপ্রসাদ কিছুতেই নাম বলবে না, লারউডও ছাড়বেন না। শেষ পর্যন্ত একটি শর্তে হরিপ্রসাদ বলতে রাজী হল। সে যে ঐ ছোকরাদের নাম জানিয়েছে এটা যেন কোনমতেই ফাঁস না হয়ে যায়। লারউড বললেন, 'না না, আমি কাউকে তোর কথা জানাব না। আমাকে বিশ্বাস করতে পারিস।'

হরিপ্রসাদ এবার নামগুলো বলল—লজ্জু, গনেরি, ধনিয়া, রামপত্, বিরজু, বুলাকী আর পদিনা। এদের মধ্যে লজ্জু আর গনেরি সবচাইতে বিপজ্জনক।

লারউড বললেন, 'ঠিক আছে, তুই কাজে যা। কোন ভয় নেই।'

বিনায়ককে সঙ্গে করে এবার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট নরোনহার অফিসে চলে এলেন লারউড।

৮

ডি এম. নরোনহার বয়স খুব বেশি না; ত্রিশ-বত্রিশ। গায়ের রং তামাটে। ব্যাক ব্রাশ করা ঘন চুল। মাঝারি ধরনের তীক্ষ্ণ চোখ, চওড়া কপাল। সরু কোমর, বুকের মাপ প্রায় চল্লিশ ইঞ্চি। বিশাল মাংসল কাঁধ, লম্বা-লম্বা হাত আর ধারালো থুতনিতে প্রবল ব্যক্তিত্বের ছাপ রয়েছে।

নরোনহা বিনায়ককে চেনেন। একটু হেসে বললেন, কী ব্যাপার মিস্টার শুক্লা? হঠাৎ কলেজ ছেড়ে আমাদের এই ডাল ইনসিসিড অ্যাটমস্ফীয়ারে?'

বিনায়ক লারউডকে দেখিয়ে বললেন, 'এঁকে নিয়ে এলাম। ইন ফ্যাক্ট এঁর জন্যেই আমাকে আসতে হয়েছে।'

নরোনহা জিজ্ঞাসু চোখে লারউডের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ইনি? এঁকে তো আগে কখনও দেখিনি—'

বিনায়ক এবার কিছু বলার আগেই লারউড নিজের পরিচয় দিয়ে জানালেন একদিন নরোনহার মতো তিনি এখানকার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন।

নিজের চেয়ার থেকে উঠে এসে লারউডের দু'হাত ধরে অন্য একটা চেয়ারে বসালেন নরোনহা। তারপর অত্যন্ত সম্ভ্রমের গলায় বললেন, 'আপনার কথা অনেক শুনেছি। এখানকার বয়স্ক লোকেরা বলে, আপনার মতো অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এই ডিস্ট্রিক্টে কখনও আসেনি। আপনাকে দেখার সৌভাগ্য যে কোন দিন হবে ভাবতেই পারিনি। ইট্স এ মোস্ট প্লেজাণ্ট সারপ্রাইজ টু মী।'

লারউডও নরোনহার দু'হাত জড়িয়ে ধরেছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারী এই যুবকটিকে খুবই ভালো লাগছিল। সস্নেহ হেসে লারউড বললেন, 'প্রথমেই একটা অনুমতি চেয়ে নিচ্ছি।'

লারউডের পাশে বসে নরোনহা বললেন, 'অনুমতি কি, আদেশ বলুন—'

লারউড বললেন, 'তোমাকে কিন্তু আপনি আজ্ঞে করে বলতে পারব না। আমি ব্যাচেলর। বিয়ে করলে তোমার মতো একটা গ্র্যাণ্ড সন থাকত।'

নরোনহা বললেন, 'নিশ্চয়ই তুমি বলবেন। না বললে আমারই খারাপ লাগবে।'

লারউড বললেন, 'এখন তো আর ইণ্ডিয়ায় সিভিল সার্ভিস নেই,

সব অ্যাডমিনিসস্ট্রেটিভ সার্ভিস হয়ে গেছে। তুমি কোন্ ইয়ারের আই. এ. এস.?'

নরোনহা বললেন, 'সিক্সটি এইটের।'

'ফাইন। কাজকর্ম কি রকম লাগছে?'

'ভালোই তো।'

'এখানকার ল অ্যাণ্ড অর্ডারের অবস্থা কেমন?'

'খারাপ না।'

'শুনেছি অ্যাডমিনিস্ট্রেসনে পলিটিক্যাল লিডাররা খুবই ইণ্টারফেয়ার করে।'

নরোনহা হাসলেন। বললেন, 'ওটা তো স্যার সব দেশেই ঘটে থাকে তবে সবই অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের ওপর ডিপেণ্ড করে। ইণ্টারফেয়ারেন্সের কাছে তিনি সাবমিট না করলেই হল।'

'রাইট।'

নরোনহা বললেন, 'অ্যাডমিনিস্ট্রেসনের কথা থাক। আপনি কোথায় উঠেছেন? ক'দিন আছেন এখানে?' ইত্যাদি ইত্যাদি।

লারউড নরোনহার প্রশ্নগুলোর উত্তর একে একে দিয়ে গেলেন।

এবার নরোনহা বললেন, স্যার, একদিন আমাদের সঙ্গে মানে আমার স্ত্রী এবং আমার সঙ্গে লাঞ্চ বা ডিনার খেলে খুব খুশি হব। বলুন কবে মিস্টার শুক্লাদের বাড়ি গিয়ে আপনাকে খাওয়ার কথা বলে আসব?'

লারউড হেসে বললেন, 'ফরম্যাল নেমন্তন্নের দরকার নেই। তোমাদের সঙ্গে খাব, ইট্‌স এ গ্রেট প্লেজার। তুমি যেদিন বলবে সেদিনই যাব।' বলতে বলতে হঠাৎ ডানদিকের দেয়ালে একটা পুরনো ছবির ওপর নজর পড়ল লারউডের। খুব চেনা ছবি। অনেক দিন আগে সেই নাইন্টিন ফোর্টি ফোর কি ফাইভে একই ট্রেনে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন আর গান্ধীজী ধমতোরি স্টেশনের ওপর দিয়ে কলকাতায় গিয়েছিলেন। লারউড তাঁদের শ্রদ্ধা জানাতে স্টেশনে গিয়েছিলেন। প্ল্যাটফর্মে গান্ধীজী এবং মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে কারা যেন তাঁর ছবি তুলেছিল। তারই একটা কপি

বাঁধিয়ে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের এই অফিসে টাঙিয়ে দিয়েছিলেন লারউড। আশ্চর্য, সাতাশ বছর পরও সেই ছবিটা এখনও রয়েছে। স্বাধীন ভারতে মাউন্টব্যাটেনের ফটো ঝুলিয়ে রাখার কোন কারণই নেই। খুব সম্ভব ছবিতে গান্ধীজী আছেন বলেই ওটা রাখা হয়েছে।

ছবিটা দেখতে খুবই ভালো লাগছিল লারউডের। ঐ ফটোটা যেন সোনার পাড় বসানো অতীতের একটা টুকরো। নরোনহাকে ছবিটা দেখিয়ে বললেন, 'গান্ধীজী আর মাউন্টব্যাটেনের পিছনে ঐ লোকটিকে চিনতে পারছ?'

নরোনহা আগে ছবিটা দেখলেও খুব ভালো করে লক্ষ্য করেননি। এখন স্থির চোখে দেখতে দেখতে অবাক হয়ে গেলেন যেন। বললেন, 'আ রে, এ তো আপনি! কী আশ্চর্য, আপনার ছবি আমার অফিসে রয়েছে, অথচ আগে মার্ক করিনি!'

লারউড বললেন, 'যদি সম্ভব হয় ছবিটার একটা কপি করে দিও তো। যা খরচ লাগে আমি দেব। মানে, পুরনো স্মৃতি তো। এটা নিজের কাছে রাখতে চাই।'

'খরচ-টরচের কথা বলে লজ্জা দেবেন না। আমাদের ফটোগ্রাফিক ডিপার্টমেণ্ট ওটা করে দেবে'খন।'

লারউড বললেন, 'অনেক গল্প-টল্প হল। এবার একটু দরকারের কথা হোক। তোমার কাছে আমার একটা অ্যাপীল আছে।'

বিব্রতভাবে নরোনহা বললেন, 'অ্যাপীল-ট্যাপীল বলে আমাকে লজ্জা দেবেন না। আপনি আমার প্রিডিসেস্সর। প্লীজ অর্ডার মী—'

লারউড হেসে কাল রাতের ঘটনার বিবরণ দিয়ে সেই ছেলেগুলোর নাম বললেন। শুনতে শুনতে নরোনহা গম্ভীর হয়ে যাচ্ছিলেন। বললেন, 'আই নো দোজ রাসক্যাল্‌স অ্যাণ্ড হুলিগ্যান্‌স। ওদের এগেনস্টে অনেক কমপ্লেন আছে। রাফায়েনগুলোকে হাজতেও পুরে দিতে পারি। কিন্তু স্যার মুশকিলটা হল, কোর্টে কেস উঠলে ওদের বিরুদ্ধে কোন উইটনেস পাওয়া যাবে না।'

'তাই বলে তো এই সব হুলিগানিজ্‌ম চলতে দেওয়া যেতে পারে না।'

'রাইট স্যার—' বলে একটু ভেবে নরোনহা আবার শুরু করলেন, 'শহরের সব ইম্পর্ট্যান্ট জায়গায় আজ থেকেই পুলিস পোস্ট করে দিচ্ছি। কেউ কোন রকম বজ্জাতি করলে যেন পিটিয়ে চামড়া তুলে দেয়।'

'থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ। তোমার এই স্টেপটা ভালো। আচ্ছা, আজ চলি। আবার দেখা হবে।'

'নিশ্চয়ই স্যার। আমি যত তাড়াতাড়ি পারি একদিন আপনার ওখানে যাচ্ছি।'

নরোনহা রাস্তা পর্যন্ত এসে লারউডকে ভোলার টাঙ্গায় তুলে দিয়ে গেলেন।

এখন বেলা দুপুর। সূর্যটা আকাশের খাড়া দেয়াল বেয়ে বেয়ে সোজা মাথার ওপর চলে এসেছে। কোথাও এক ফোঁটা মেঘ বা কুয়াশা নেই। আকাশ জুড়ে এখন শুধু ঝকমকে রোদ।

ডি. এম-এর অফিস থেকে বেরিয়ে লারউডরা সোজা বাড়িই ফিরে যাচ্ছিলেন। খানিকটা যাবার পর এক জায়গায় এসে টাঙ্গাটা হঠাৎ থেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো গলার মিলিত চিৎকার কানে এলো। চমকে মুখ তুলে রাস্তায় তাকাতেই লারউডের চোখ পড়ল ডানদিকের একটা বড় চারতলা বাড়ি থেকে অগুনতি ছেলেমেয়ে উত্তেজিতভাবে চেঁচাতে চেঁচাতে বেরিয়ে আসছে।

লারউড লক্ষ্য করলেন, বড় বাড়িটার গায়ে একটা প্রকাণ্ড টিনের বোর্ডে লেখা আছে, ধমতোরি ডিগ্রি কলেজ। বিনায়ককে বললেন, 'কী ব্যাপার, কলেজের ছেলেমেয়েরা ঐভাবে বেরিয়ে আসছে কেন? চিৎকারই বা করছে কেন?'

বিনায়ক বলল, 'ঠিক বুঝতে পারছি না। ডিগ্রি কোর্সের ফাইনাল

পরীক্ষা চলছিল। কী হল কে জানে। আপনি একটু বসুন। আমি খবরটা নিয়ে আসছি।'

বিনায়ক মিনিট তিন-চারেক পর ফিরে এসে বলল, 'সেই ক্রনিক ডিজিজ।'

লারউড উদগ্রীব হয়েছিলেন। বললেন, 'কী হয়েছে?'

বিনায়ক জানালো, 'পরীক্ষার কোশ্চেন পেপার নাকি কঠিন হয়েছে, এই অছিলায় ছাত্ররা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। তার ওপর ইনভিজিলেটররা তাদের বই থেকে টুকতে দ্যাননি। ফলে তারা ক্ষেপে একজামিনেশন হল থেকে দল বেঁধে বেরিয়ে এসেছে। তাদের দাবি টুকতে দিতে হবে। প্রিন্সিপ্যাল তা মেনে না নেওয়ায় প্রোটেস্ট হিসেবে ওরা পরীক্ষা বয়কট করেছে।'

শুনতে শুনতে অবাক হয়ে যাচ্ছিলেন লারউড, 'টুকতে দিতে হবে!'

বিনায়ক হাসল, 'না হলে পাস করবে কি করে।' একটু থেমে বলল, 'বেশ কয়েক বছর ধরে হোল কান্ট্রির প্রায় সব ইউনিভার্সিটির পরীক্ষাতেই এই মাস কপিং চলছে। বাধা দিলেই হৈ-চৈ, চিৎকার, ঘেরাও, নানারকম ঝামেলা।'

'বল কি? ছেলেরা পড়াশোনা করতে চায় না?'

'কিছু ভালো ছেলেকে বাদ দিলে অ্যাভারেজ ছাত্রদে . মধ্যে পড়াশোনা ব্যাপারটা নেই বললেই চলে।'

লারউড বিমর্ষ মুখে বললেন, 'এভাবে চললে এখানে এডুকেশনের কী হবে?'

বিনায়ক হাসল, 'খুব মন খারাপ হয়ে গেছে তো? এত কাল বাদে ইণ্ডিয়ায় এলেন। ইয়ারো আনভিজিটেড থাকলেই বোধহয় ভালো হত। তাই না?'

লারউড উত্তর দিলেন না।

এক সময় একটানা সেই অশ্বক্ষুরের ধ্বনি নারায়ণদাস শুক্লাদের গথিক আর্কিটেকচারের সুবিশাল বাড়িটার সামনে এসে থামল।

দেখতে দেখতে বেশ কয়েকটা দিন কেটে কেটে গেল। লম্বা লম্বা পা ফেলে শীত যে অনেক এগিয়ে এসেছে, সেটা টের পাওয়া যাচ্ছে। বাতাসে এখন প্রায় সারাদিনই হিমের গুঁড়ো মিশে থাকে। সকালের দিকে অনেকটা বেলা পর্যন্ত আর বিকেলের পর থেকে সন্ধ্যা এবং গোটা রাতটা দূরের পাহাড়ী রেঞ্জটা কুয়াশায় ঝাপসা হয়ে থাকে। রোদের রঙও দ্রুত মলিন হয়ে যাচ্ছে।

এর মধ্যে নিয়ম করে লারউড রোজ সকালে এবং বিকেলে ধমতোরি শহরে ঘুরতে বেরিয়েছেন। সাতাশ বছর আগে যাদের তিনি চিনতেন তাদের বেশির ভাগই মরে-টরে গেছে। ছু-চারজন যারা বেঁচে আছে তাদের খোঁজ খবর করে দেখা করে এসেছেন। এদের কেউই সুখে নেই। বেশির ভাগই বয়সের ভারে অথর্ব হয়ে পড়েছে। কেউ কেউ তো শয্যাশায়ীই। যেমন নওলকিশোর, অযোধ্যাপ্রসাদ আর শিউলালজীর কথাই ধরা যাক।

নওলকিশোর একসময় ছিলেন লারউডের সেরেস্তার হেড ক্লার্ক। পায়ের তলা থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত সৎ, বিনয়ী এবং ভদ্র। তবে অত্যন্ত গোঁড়া আর সংস্কারাচ্ছন্ন ব্রাহ্মণ ফ্যামিলির ছেলে। গোঁড়ামি আর সংস্কার তাঁর হাড়ের ভেতর ঢোকানো রয়েছে।

এই নওলকিশোরজী একসময় ছিলেন একজন অত্যন্ত বলশালী পুরুষের মতো পুরুষ। এখন আর তাঁকে চেনা যায় না। হাড়-বার-করা রোগা ছুর্বল শরীর নিয়ে দিনরাত ইজিচেয়ারে শুয়ে থাকেন। শুধু শারীরিক না, মানসিক দিক থেকে একেবারে ভেঙেচুরে গেছেন। তাঁর ভেঙে পড়ার একমাত্র কারণ তাঁর বড় নাতনী রজনী। আট-দশ বছর আগে মেয়েটাকে শখ করে কলেজে পড়াতে পাঠানো হয়েছিল। পড়তে গিয়ে ক্লাস ফ্রেণ্ড 'অচ্ছুৎ'দের একটি ছেলের সঙ্গে তার ভাব-ভালোবাসা

হয় এবং রায়পুরে গিয়ে সেখানে এক ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে বিয়ে করে ওরা পালিয়ে যায়। খবরটা পাওয়ামাত্র হার্ট অ্যাটাক হয়ে গিয়েছিল নওলকিশোরের। তার পর থেকেই শরীরটা আর ভালো হল না।

লারউড জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'রজনীরা এখন কোথায় আছে?'

নওলকিশোরজী বলেছিলেন, 'বিলাসপুরে।'

'ওর স্বামী কি করে?'

'ওখানকার এস.ডি.ও.।'

লারউডের চমক লেগেছিল যেন। বলেছিলেন, 'তাহলে তো বেশ ভালো ছেলে। সাবডিভিসানাল অফিসার হতে হলে মিনিমাম আই. এ.এস. হতে হয়।'

নওলকিশোর বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, লেখাপড়ায় খুবই ভালো। আই. এ.এস. কমপীট করে হোল কান্ট্রিতে সেকেণ্ড হয়েছিল।'

'এমন ছেলে আপনাদের ব্রাহ্মণ কমিউনিটির মধ্যে ক'টা আছে? আর থাকলেও রজনীকে বিয়ে করার জন্যে কত পণ হাঁকত! পারতেন দিতে?'

নওলকিশোরজী স্বীকার করেছিলেন, তাঁর যা অবস্থা তাতে বাড়িঘর জমিজমা সর্বস্ব বিক্রি করেও ব্রাহ্মণ কমিউনিটি থেকে ও রকম ছেলে তাঁরা যোগাড় করতে পারতেন না।

লারউড বলেছিলেন, 'তা হলে তো আপনাদের খুশি হওয়াই উচিত। অমন ভালো নাতজামাই করার জন্যে রজনীকে অবশ্যই কনগ্রাচুলেট করা দরকার।'

নওলকিশোর বিপন্ন মুখে বলেছিলেন, 'কিন্তু ছেলেটা যে অচ্ছুৎ।'

'স্বাধীন দেশে এখনও মানুষ অচ্ছুৎ হয়ে আছে! স্ট্রেঞ্জ!'

নওলকিশোর উত্তর দ্যান নি। তবে তাঁর মুখ চোখ দেখে মনে হয়েছিল হাজার হাজার বছরের সংস্কার আর গোঁড়ামি তাঁর শরীরের সব রক্ত দূষিত করে রেখেছে। এসব কাটিয়ে ওঠা তাঁর পক্ষে সম্ভব না। লারউড

নওলকিশোরকে কিছু বলেন নি তবে মনে মনে স্থির করে রেখেছেন একদিন বিলাসপুর গিয়ে রজনীদের, বিশেষ রজনীকে তিনি আশীর্বাদ করে আসবেন। এই দুঃসাহসী মেয়েটা যে জগদ্দল পাথরের মতো অনড় একটা সংস্কার ভাঙতে পেরেছে, সেজন্য তিনি খুবই আনন্দিত।

অযোধ্যাপ্রসাদের সমস্যা অন্য ধাঁচের। বৃটিশ আমলে ভদ্রলোক ছিলেন এক্সাইজ অফিসার। দু'হাতে ঘুষ খেতেন। ওঁর স্ত্রী বছর বছর ছেলেমেয়ের জন্মদান করত। ছেলেপুলে বা সংসারের দিকে নজর ছিল না অযোধ্যাপ্রসাদের। ঘুষই ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান। অঢেল কাঁচা পয়সা হাতে এলে যা হয়, তাঁর বেলাতেও এরা হেরফের ঘটেনি। মদ্যপান তো ছিলই, মার্কেটের ওধারে সেই বাঈজীপাড়ায় একেবারে একজোড়া খানদানী রক্ষিতা রেখেছিলেন। সুতরাং দু'হাত দিয়ে যে ঘুষের পয়সা ঢুকত, চার হাত দিয়ে তা বেরিয়ে যেত।

সাতাশ বছর পর সেই ঘুষখোর, দু'কান-কাটা লম্পট অযোধ্যাপ্রসাদকেও চেনা যাচ্ছিল না। অনবরত ড্রিঙ্কের জন্য একটি জমজমাট সিরোসিস আর জোড়া মেয়েছেলে পোষার উপকারিতা স্বরূপ একটি সিফিলিস সংগ্রহ করেছিলেন ভদ্রলোক। কয়েক শো ইঞ্জেকসান আর হাজার চারেক ট্যাবলেট শরীরে ঢুকবার পর সিফিলিসটা সেরেছে; তবে অযোধ্যাপ্রসাদের খসখসে কালচে চামড়ায় নিজের চিরস্থায়ী স্ট্যাম্পটি মেরে রেখে গেছে। কিন্তু সিরোসিসটি একেবারে সারেনি; ওটা বাকী জীবনের সঙ্গী হয়েই থাকবে।

লম্বা সাতাশ বছর বাদে অযোধ্যাপ্রসাদের সঙ্গে দেখা হবার পর আক্ষেপ করে তিনি বলেছিলেন, 'মাইনে এবং ঘুষ বাবদ যত টাকা রোজগার করেছেন তাঁর এইট্টি পারসেন্ট তাঁর নিজের জন্যই খরচ হয়ে গেছে। বাকী টোয়েন্টি পাঁরসেন্টে সংসারের কতটুকু আর সুবিধা হবে? মোট এগারোটা ছেলেমেয়ের মধ্যে কেউ বিশেষ লেখাপড়া শেখে নি। শেষ বয়সে মেয়েদের বিয়ে-দেবার পয়সা নেই। বড় দুটো মেয়ে দুটো ছেলে যোগাড় করে পালিয়ে গেছে। বাকী তিন মেয়ে কবে ভাগবে, সেই

আশায় বসে আছেন অযোধ্যাপ্রসাদ। তাঁর ধারণা, খুব বেশি দেরি হবে না। ছেলেগুলো অমানুষ হয়েছে। দিনরাত মার্কেটের কাছে বসে সিগারেট ফোঁকে, সন্ধ্যের পর চোলাই-করা দিশী লিকার খায়, মেয়ে দেখলে সিস দেয়, নানারকম অঙ্গভঙ্গি করে, রাত্তিরে মওকা পেলে ছিনতাই করে, রেলের ওয়াগন ভেঙে মাল সরায়।

ছেলেদের ভবিষ্যৎ যে কী, অযোধ্যাপ্রসাদ তা জানেন না। এই শেষ বয়সে এক কালের দুর্দান্ত মাতাল, ওম্যানাইজার লম্পট ঘুষখোর অপরিণামদর্শী অযোধ্যাপ্রসাদ সন্তানদের কথা ভেবে রাত্রে ঘুমোতে পারেন না।

শিউলালজীর সমস্যা আরেক ধরনের। সেই বৃটিশ আমলে তিনি ছিলেন ধমতোরির পোস্টমাস্টার। অত্যন্ত নিরীহ আর ধর্মপ্রাণ মানুষ শিউলালজী। কারো সাতে-পাঁচে থাকতেন না। চিঠি স্ট্যাম্প মনিঅর্ডার এ সবের মধ্যেই তাঁর পৃথিবী ছিল সীমাবদ্ধ। যৌবনে একবার শুধু কয়েক মাসের ছুটি নিয়ে দণ্ডী কেটে অমরকণ্টক থেকে নর্মদা নদীর পাড় ধরে কাম্বে উপসাগর পর্যন্ত নাকি গিয়েছিলেন।

ভদ্রলোক এখন এই বৃদ্ধ বয়সে বিপত্নীক হয়েছেন। দুই মেয়ে তাঁর। বড়টি বিধবা হয়ে তিনটি ছেলেপুলে নিয়ে বাবার কাছে এসে আছে। ছোট মেয়ে প্রেম করে একটি মারাঠী ছেলেকে বিয়ে করেছিল। শিউলালজীর কোন রকম গোঁড়ামি বা বাজে সংস্কার নেই। ইণ্টার-প্রভিন্সিয়াল ম্যারেজ তিনি দ্বিধাশূন্যভাবে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু এ বিয়ে সুখেরও হয় নি, স্থায়ীও না। মাস কয়েক বাদে ছোট মেয়ে শোভা বাবার কাছে ফিরে এসেছে। স্বামীর সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে না। ওরা শিগগিরই ডিভোর্স করবে।

আসলে ব্যাপারটা এই রকম। যে ছেলেটাকে শোভা বিয়ে করেছিল সেই দিলীপ পুণেকর এমনিতে খুবই ভালো, তবে তার শিরদাঁড়ায় জোর নেই। পুণে থেকে এখানে রেলওয়েতে চাকরি নিয়ে এসেছিল দিলীপ। শোভার সঙ্গে আলাপ করে ভালো লেগে যায়। তখন তাকে ছাড়া আর কিছুই বুঝত না সে। একদিন তার সঙ্গে

সোজা ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে চলে গিয়েছিল দিলীপ। বিয়ের পর শোভা দিলীপের রেল কোয়ার্টারে গিয়ে ওঠে।

এ পর্যন্ত ব্যাপারটা মোটামুটি মসৃণ। কিন্তু বিয়ের খবর জানার পর পুণে থেকে দিলীপের মা বাবা যেই ধমতোরিতে দৌড়ে এলো, তখন থেকেই সব ব্যাপারটা গোলমেলে হয়ে যায়। এই বিয়ে তারা মেনে নিতে রাজী না। ফলে অশান্তি খিটিমিটি শুরু হয়ে যায়। দুর্বল ব্যক্তিত্ব-হীন ভীরু দিলীপ মা-বাবার ভয়ে শোভাকে শিউলালজীর কাছে পাঠিয়ে দেয়। শিগগিরই ওরা ডিভোর্সের মামলা আনবে। তার আগে দিলীপকে ট্রান্সফার করিয়ে অন্য জায়গায় নিয়ে যাবার তোড়জোড় চলছে।

শুনতে শুনতে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন লারউড। চিৎকার করে বলেছিলেন, 'দিস ইজ ইনহিউম্যান। দিলীপ আর তার মা বাপ কি এখানেই আছে?'

শিউলালজী বিমর্ষভাবে মাথা নেড়ে জানিয়েছেন, 'জী।'

'রেল কোয়ার্টারগুলো কোন্ দিকে?'

'শহরের ডান দিকে। নয়া কলোনির গা ঘেঁষে। লেকিন রেল কোয়ার্টারের খোঁজ নিচ্ছেন যে স্যার?'

লারউড বলেছিলেন, 'দিলীপের মা-বাবার সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই।'

হাত জোড় করে করুণ মুখে শিউলালজী বলেছিলেন, 'স্যার, মোটে ক'টা দিনের জন্যে আপনি ইণ্ডিয়ায় এসেছেন। দয়া করে আমার জন্যে দিলীপদের ওখানে যাবেন না। ভাগ্যে আমার যা আছে তাই হোক।'

লারউড তার পিঠে একটা হাত বিছিয়ে দিয়ে বলেছেন, 'আপনি কিছু ভাববেন না শিউলালজী, এত বড় একটা অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। কিছু না করলে মেয়েটার জীবন নষ্ট হয়ে যাবে।'

মাথায় ইট লেগে রক্তারক্তি ঘটিয়ে আসার পর লারউডকে আর একা ছাড়া হয় নি। রোজ তাঁর সঙ্গে কেউ না কেউ থাকেই। প্রথম দিনকয়েক কলেজ ছুটি নিয়ে বিনায়ক তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছে। নারায়ণদাসজীও এক আধ দিন সঙ্গে গেছেন। আজ দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর খবরের কাগজ পড়তে পড়তে হঠাৎ রাহুলজী আর সুষমার কথা মনে পড়ে গেল লারউডের। নানা ঘটনার ভিড়ে আর পুরনো দিনের পরিচিত নানা মানুষের কাছে ঘোরাঘুরি করতে করতে এ ক'দিন ওদের ভুলেই গিয়েছিলেন।

ওদের কথা ভাবতে ভাবতে আচমকা বিদ্যুৎ-চমকের মতো একটা সম্ভাবনা মাথায় এসে গেল। হাতের কাগজটায় চোখ থাকলেও এরপর তিনি আর কিছুই পড়তে পারছিলেন না। চোখের সামনে থেকে সমস্ত দৃশ্যপট দ্রুত ঝাপসা হয়ে যেতে লাগল। সেই সম্ভাবনার ব্যাপারটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার ভাবতে লাগলেন। আর যতই ভাবলেন ততই ভালো লাগতে লাগল।

এক সময় বিকেল হয়ে গেল। রোদ ডিমের কুসুমের মতো গাঢ় হলুদ হয়ে ধমতোরির বাড়িঘর গাছপালার মাথায় গড়িয়ে যেতে লাগল।

হঠাৎ উঠে পড়লেন লারউড। চৌকো চৌকো শ্বেতপাথর বসানো মেঝে পেরিয়ে ডানদিকে যেতে যেতে ডাকতে লাগলেন, 'মাধুরী—মাধুরী—'

মাধুরী ওধারের বিশাল বারান্দায় একটা বেতের চেয়ারে বিষণ্ণ প্রতিমার মতো চুপচাপ বসেছিলেন। তাঁর চোখ ছিল দূর আকাশে, যেখানে ধু-ধু শূন্যতার রঙিন কাগজের কুচির মতো হাজার হাজার পাখি উড়ছিল।

আগেও ঠিক এইভাবে মাধুরীকে বেশ কয়েকদিন বসে থাকতে

দেখেছেন লারউড। নারায়ণদাসদের কাছে শুনেছেন, বিনোদের মৃত্যুর পর থেকেই কি রকম যেন হয়ে গেছেন মাধুরী। চুপচাপ, বিষণ্ণ নিষ্প্রাণ। পৃথিবীর সব কিছু থেকেই নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন যেন।

মাধুরীকে দেখতে দেখতে গভীর সহানুভূতিতে মন ভরে যেতে লাগল লারউডের। কাছে এসে খুব আস্তে করে ডাকলেন, 'মাধুরী—'

একটু চমকে মুখ ফেরালেন মাধুরী। বললেন, 'চাচাজী, আপনি ?'

লারউড বললেন, 'হ্যাঁ, একটু বেরুব ভাবছি।'

ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ালেন মাধুরী। বললেন, 'পাঁচ মিনিট বসে যাও চাচাজী ; আমি আপনার লেমন টী করে আনছি।'

চায়ের জন্য তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না। এখন চা খাব না। তুমি একটা ভালো শাড়ি পরে এসো।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন মাধুরী। আস্তে করে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন ?'

লারউড হাসলেন। বললেন, 'দিনরাত বাড়িতে মুখ বুজে চুপচাপ মনমরা হয়ে বসে থাকো ; এটা ঠিক না। মাঝে মাঝে একটু-আধটু বেরুতে তো হয়। যাও, তাড়াতাড়ি শাড়িটা বদলে এসো।'

লারউডের বলার মধ্যে এমন এক আন্তরিকতা আর গভীর স্নেহ মাখানো রয়েছে যে মাধুরী না বলতে পারলেন না। খানিকক্ষণ কী ভেবে বললেন, 'আপনি একটু দাঁড়ান চাচাজী। আমি আসছি।'

মিনিট পাঁচেক বাদে লারউড আর মাধুরী বেরিয়ে পড়লেন।

বাড়ির কম্পাউণ্ডের বাইরের রাস্তায় ভোলার টাঙ্গা যথারীতি দাঁড়িয়ে আছে। অন্যদিন ভোলাকে খানিকক্ষণ বকাঝকা করে তবে তার টাঙ্গায় ওঠেন লারউড। আজ কিছু না বলেই উঠলেন। কেননা মাধুরী সঙ্গে রয়েছেন। হেঁটে এখান থেকে নিউ কলোনি পর্যন্ত যেতে তাঁর খুবই কষ্ট হবে।

ওঠামাত্র ভোলার টাঙ্গা চলতে শুরু করেছিল। মাধুরীর সঙ্গে এলোমেলো কথা বলছিলেন লারউড। হঠাৎ জমকালো বাজনার আওয়াজ

শুনে সামনে তাকাতেই লারউড দেখতে পেলেন বিন্ধ্যাচলী সিং-এর সেই ব্যাণ্ডপার্টি আর হাতি আসছে। আরো একটা ব্যাপার চোখে পড়ল তাঁর। সেদিন রাত্তিরে মার্কেটের কাছে যে ছোকরাগুলো তাঁকে ইঁট মেরেছিল তারা রাস্তায় দু-ধারের দেয়ালে পোস্টার সাঁটছে। পোস্টারগুলোতে লেখা রয়েছে—'বিন্ধ্যাচলী সিংকে ভোট দিন।' তার মানে ইলেকসানের তারিখ এগিয়ে আসছে।

একটু পর বিন্ধ্যাচলীর হাতি এবং ব্যাণ্ডপার্টির পাশ দিয়ে ভোলা তার টাঙ্গাটা বার করে নিয়ে গেল।

মার্কেটের কাছাকাছি আসতে দেখা গেল, তিন-চারটে পুলিস সিনেমা হলের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। সেদিন নরোনহাকে বলে আসার পর থেকেই এই পুলিস পোস্টিং-এর ব্যবস্থা হয়েছে। নরোনহা সাহেব তাঁর কথা রেখেছেন।

মার্কেট ছাড়িয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে ওঁরা নিউ কলোনিতে পৌঁছে গেলেন।

লারউডের সঙ্গে মাধুরীকে দেখে রাহুলজী যে কী করবেন, কী খাওয়াবেন, কোথায় বসাবেন, ঠিক করতে পারছিলেন না। তাঁকে থামিয়ে খাটের কাছে লারউড আর মাধুরী দুটো হাতল-ভাঙা চেয়ারে বসলেন। সুষমা চা আর খাবারটাবারের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছিল, লারউড যেতে দিলেন না। তাঁর কাছে একটা বেতের মোড়ায় জোর করে বসিয়ে রাখলেন।

রাহুলজী মাধুরীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি এসেছ, আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। সেই বিয়ের পর বিনোদের সঙ্গে এসেছিলে। তারপর এই এলে।' গভীর দুঃখের গলায় বললেন, 'আহা, বিনোদটা ওভাবে আমাদের ছেড়ে চলে গেল!'

লারউড বললেন, 'মাধুরীকে আপনি তাহলে চেনেন? আমি ভেবেছিলাম, এই বুঝি প্রথম দেখলেন।'

'কী আশ্চর্য, চিনব না! বিনোদ ছিল আমার অত্যন্ত প্রিয় ছাত্র।

ওর বিয়েতে আমি বরযাত্রী গিয়েছিলাম। তোমার মনে আছে মা ?'

মাধুরী মাথা নাড়লেন, 'আছে চাচাজী—'

রাহুলজী বললেন, 'রায়পুরে ওদের বাড়ি গিয়েছিলাম। ওর বাবা-কাকারা কত যত্ন করেছিলেন। এমন আদর-যত্ন আর কোথাও পাইনি।' একটু থেমে মাধুরীকে বললেন, 'সে সব কতদিন আগের কথা। তারপর এই তোমাকে দেখলাম। আমি অথর্ব হয়ে বিছানায় পড়ে আছি, কোথাও যেতেও পারি না। মাঝে মাঝে তোমরা এলে ভালো লাগত। এই বুড়োকে একেবারেই ভুলে গেছ।'

মাধুরী বললেন, 'আমার কথা সবই তো জানেন চাচাজী। আমার কোথাও বেরুতে ইচ্ছে করে না।'

'তবু বেরুতে তো হবে। বাড়িতে ওভাবে বসে থাকলে শরীর মন দুই-ই খারাপ হয়ে যাবে।'

লারউড বললেন, 'আমিও তো সেই কথাই বলি। আজ জোর করেই ধরে নিয়ে এলাম।'

রাহুলজী বললেন, 'বেশ করেছেন।' তারপর মাধুরীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'নারায়ণদাসজী কেমন আছেন ?'

মাধুরী বললেন, 'এই বয়সে যতটা ভালো থাকা যায়। তবে হাই প্রেসার, ব্লাড সুগার, একটা চোখে ছানি, বাত, সবই আছে।' বলে হাসলেন।

ওঁদের কথাবার্তার ফাঁকে কখন সুষমা উঠে গিয়েছিল, টের পাওয়া যায় নি। ট্রেতে চা এবং মিষ্টি-টিষ্টি সাজিয়ে এখন ফিরে এলো।

মাধুরী সস্নেহে হেসে বললেন, 'দুষ্টু মেয়ে। এসব করতে গেলে কেন ?'

সুষমা উত্তর দিল না। মুখ নামিয়ে সবার সামনে চায়ের কাপ-টাপ সাজিয়ে দিল। মাধুরী তাকে টেনে কাছে বসালেন। তারপর মিষ্টির প্লেটটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'খাও—'

সুষমা কিছুতেই খাবে না। মাধুরী বললেন, 'সে না খেলে তিনি কিছুই ছোঁবেন না।' এক রকম জোর করেই সুষমার মুখে একটা মিষ্টি

পুরে দিয়ে আদরের ভঙ্গিতে তার পিঠে একটা হাত বিছিয়ে দিলেন।

লারউড চোখের কোণ দিয়ে মাধুরী আর সুষমাকে দেখছিলেন। তাঁরও খুব ভালো লাগছিল।

এদিকে রাহুলজী বলছিলেন, 'তোমার শাশুড়ি কেমন আছেন?'

'ভালো।'

'একদিন ওঁদের তুজনকে নিয়ে এসো। ক'দিনই বা বাঁচব। হয়তো আর দেখাই হবে না।'

মাধুরী বললেন, 'নিশ্চয়ই নিয়ে আসব।'

একটু চুপ করে রইলেন রাহুলজী। হঠাৎ কী মনে পড়তে খুব ব্যস্ত-ভাবে বলে উঠলেন, 'ভালো কথা, তোমার একটা ছেলে আছে না?'

'মাধুরী বললেন, 'হ্যাঁ।'

'ছেলেবেলায় কয়েকবার দেখেছি। শুনেছিলাম ভূপালে হোস্টেলে থেকে পড়ে।'

'পড়ত, তবে এখন আর পড়ে না। ও এম. এ. পাস করে গেছে।'

'শুনেছি খুব ব্রিলিয়াণ্ট তোমার ছেলে—'

মাধুরী হাসলেন, আপনাদের আশীর্বাদে ও পড়াশোনায় ভালই।'

'ঐ দেখ নামটাই জিজ্ঞেস—'

এই সময় আচমকা মাধুরীর পাশ থেকে সুষমা বলে উঠলেন, 'বিনায়ক শুক্লা।'

সবাই অবাক হয়ে সুষমার দিকে তাকালেন। রাহুলজী এতক্ষণ বালিশের ওপর মাথা রেখে এদিকে কাত হয়ে কথা বলছিলেন। এবার হাতের ভর দিয়ে উঠে বসলেন। সুষমাকে বললেন, 'তুই চিনিস?'

'হ্যাঁ, উনি আমাদের কলেজের লেকচারার।'

'আশ্চর্য, তুই বিনোদের ছেলের কথা জানিস আর আমি কিছুই জানি না।'

রাহুলজীর বলার মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যাতে মাধুরী আর লারউড হেসে ফেললে। সুষমা হকচকিয়ে একবার ওঁদের দেখেই মুখ নামিয়ে নিল।

লারউড বললেন, 'এটাই তো ন্যাচারাল রাহুলজী। আপনি বা আমি যেমন আমাদের জেনারেসানের নারায়ণদাসজীকে জানি তেমনি সুষমা ওদের জেনারেসানের বিনায়ককে চেনে।'

সুষমার মাথা নিচের দিকে আরো ঝুঁকে পড়ল।

রাহুলজী এবার মাধুরীকে বললেন, 'বিনায়ককে একবার আসতে বোলো। ওকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে।'

মাধুরী বললেন, 'কালই ওকে পাঠিয়ে দেব।'

আরো কিছুক্ষণ গল্প-টল্প করে লারউডরা উঠে পড়লেন। সুষমা ওঁদের সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা পর্যন্ত এলো। মাধুরী তাকে বুকের কাছে টেনে এনে আদর করে বললেন, 'এক দিন আমাদের বাড়ি যেও।'

সুষমা আস্তে করে মাথা নাড়ল, 'আচ্ছা।'

মাধুরী আর লারউড ভোলার টাঙ্গায় উঠে পড়লেন।

ফেরার পথে লারউডের চোখে পড়ল দু'ধারের বাড়ির দেয়াল বিন্ধ্যাচলী সিং-এর ছবিওলা পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে গেছে। এই মুহূর্তে তিনি বিন্ধ্যাচলী বা সামনের নির্বাচনের কথা ভাবছিলেন না। তাঁর সমস্ত ভাবনা জুড়ে এখন শুধু রাহুলজী আর সুষমা।

পাশের সীটে চুপচাপ বসে আছেন মাধুরী। দূরমনস্কের মতো রাস্তার দু-দিকের বাড়িঘর, লোকজন, টাঙ্গা বা সাইকেল-রিক্শা দেখে যাচ্ছিলেন।

এক সময় ঘাড় ফিরিয়ে মাধুরীকে দেখলেন লারউড। আস্তে করে নরম গলায় ডাকলেন, 'মাধুরী—'

একটু চমকে লারউডের দিকে তাকালেন মাধুরী। লারউড সস্নেহে হেসে বললেন, 'কী ভাবছিলে? নিশ্চয়ই সুষমার কথা?'

মাধুরী অবাক। বললেন, 'আপনি কী করে জানলেন?'

'সুষমার মতো মেয়েকে দেখলে ওর কথা না ভেবে পারা যায়!'

একটু থেমে ফের লারউড বললেন, 'চমৎকার মেয়ে, তাই না?'

'হ্যাঁ। ধীর, স্থির, নম্র। একালে এমন মেয়ে বড় একটা দেখা যায় না।'

'তার ওপর লেখাপড়াও শিখেছে। গ্র্যাজুয়েট।'

'তাই নাকি ?'

লারউড মাথা নাড়লেন। বললেন, 'তবে ওকে নিয়ে রাহুলজীর ভীষণ দুর্ভাবনা।'

একটু উদ্বিগ্নভাবেই মাধুরী বললেন, 'কেন ?'

'রাহুলজীর তো ঐ অবস্থা। দুটো স্ট্রোকের পর একেবারে বেড-রিড্‌ন হয়ে আছেন। যে কোন দিন মারা যেতে পারেন। এদিকে মেয়েটার বিয়ে দিতে পারছেন না। পারলে মৃত্যুটা শান্তির হত।'

'ঐ রকম একটা ভালো মেয়ের বিয়ে আটকাচ্ছে কিসে ? যে কোন বড় ঘর থেকে ওকে মাথায় করে নিয়ে যাওয়া উচিত।'

'সেটা তুমি বুঝলে, আমিও বুঝলাম ! কিন্তু আর কেউ তা বুঝতে চায় না। বিয়েটা আটকে আছে টাকার জন্যে। রাহুলজীর টাকা নেই।'

খানিকটা সময় চুপচাপ। তারপর লারউডই আবার শুরু করলেন, 'তোমার কাছে আমার একটা আর্জি আছে মাধুরী—'

মাধুরী বললেন, 'বিনয়ের সঙ্গে সুষমার বিয়ে দিতে হবে, এই তো ?' বলে ভারি সুন্দর করে হাসলেন।

প্রথমটা হকচকিয়ে গেলেন লারউড। তারপর উচ্ছ্বসিত হয়ে হাসতে হাসতে বললেন, 'ঠিক, ঠিক, ঠিক—'

মাধুরী বললেন, 'প্রথম যখন আপনি আমাকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরুলেন তখন মনে হয়েছিল, এমনিই বুঝি বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু রাহুলজীর বাড়ি গিয়ে সুষমাকে দেখেই অন্য গন্ধ পেলাম।'

লারউড বললেন, 'ও বাড়িতে পা দিয়েই ধরে ফেললে, অ্যাঁ ! তোমাকে তাহলে ফাঁকি দিতে পারিনি !' বলে দারুণ খুশি হয়ে নিষ্পাপ শিশুর মতো হাসতে লাগলেন। মাধুরীর হাতে ধরা পড়াটাও যেন খুবই সুখের ব্যাপার।

মাধুরীও হাসছিলেন। বিনোদের মৃত্যুর পর এভাবে তিনি আর কখনও হাসেননি।

লারউড এবার বললেন, 'আমার আর্জি মঞ্জুর তো ?'

মাধুরী বললেন, 'আর্জি কেন বলছেন, আদেশ বলুন।' একটু থেমে বললেন, 'আপনি বলেছেন, তার ওপর কারো কোন কথা থাকতে পারে না।'

'কিন্তু বিনয়ের একটা মতামতও দরকার। মানে ওরও বিয়ের ব্যাপারে কিছু বলার থাকতে পারে।'

'কিছু বলার নেই। ওদিকটা আমি দেখব।'

গভীর গলায় লারউড বললেন, 'রাহুলজীর মেয়েকে ঘরে আনলে তোমরা ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাবে।'

মাধুরী বললেন, 'ঈশ্বরের আগে আপনার আশীর্বাদটা বেশি দরকার।'

মাধুরীর মাথায় আলতো করে একটা হাত রেখে লারউড বললেন, 'আমি তো সব সময়ই আশীর্বাদ করছি। তোমরা সুখী হও।'

কিছুক্ষণের মধ্যে ওঁরা বাড়ি পৌঁছে গেলেন।

রাত্তিরে সবাই একসঙ্গে খেতে বসেছিলেন। এখানে আসার পর দিনের বেলা সবাই মিলে খাওয়াটা হয়ে ওঠে না। কেননা, বিনায়কের বেশির ভাগ দিনই দশটায় ক্লাস থাকে। দুর্গাবতীর পুজোটুজো সেরে খেতে বসতে আড়াইটে-তিনটে হয়ে যায়। তাই রাত্তিরের খাওয়াটা সবাই একসঙ্গে বসে খায়।

খাওয়ার টেবলে বিনায়কের সঙ্গে সুষমার বিয়ের কথাটা বলেছেন মাধুরী। নারায়ণদাস আর দুর্গাবতী খুবই খুশি হয়েছেন। বিনায়ক এখন বিয়ে করবে না বলে কিছুক্ষণ গাঁইগুঁই করেছিল। তাকে থামিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে থামার আগে লারউডকে সে শুধু বলেছে, 'এককালের জবরদস্ত ব্রিটিশ সিভিলিয়ান সাতাশ বছর পর ইণ্ডিয়ায় এসেছেন তাহলে এই মিশন নিয়ে ?'

বুঝতে না পেরে লারউড জিজ্ঞেস করলেন, 'কী মিশন ?'

'আমার বিয়ের ঘটকালি। একটা নিরীহ ছেলে আজাদী চিড়িয়ার

মতো উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছিল। তার পায়ে শিকলি না পরালে চলছিল না!' বলে মুখটা গম্ভীর করল বিনায়ক, 'দিস ইজ ওল্ড ব্রিটিশ ট্র্যাডিসান; কাউকে স্বাধীন থাকতে দেয় না। যেভাবে পারো বেড়ি পরিয়ে দাও; ইট ইজ দেয়ার প্রিন্সিপ্‌ল্।'

টেবলের চারদিক থেকে হাসি যেন বিস্ফোরণের মতো ফেটে পড়ল।

তবে সব শব্দ ছাপিয়ে যাঁর হাসি বেশি করে শোনা যেতে লাগল তিনি হলেন স্টিফেন লারউড।

১১

পরের দিন সকালে আর বাইরে বেরুনো হল না। আটটা বাজতে না বাজতেই স্রোতের মতো লোকজন আসতেই শুরু করল। প্রথমে এলো ধনেরিলাল। এককালের বিখ্যাত ছিঁচকে চোর এবং এখনকার রেলওয়ে ভেণ্ডার। ধনেরিলাল লারউডকে একবার তার বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য অনবরত ঘ্যানর ঘ্যানর করে গেল।

ধনেরিলালের পর এলো ছবিলদাসজীর ছেলে আনন্দীদাস। সে একেবারে তাদের ফোর্ড গাড়িখানা নিয়ে এসেছে। সেদিন গ্রেট ন্যাশনাল স্টোর্সে দেখা করে লারউড কথা দিয়ে এসেছিলেন শিগগিরই একদিন আনন্দীদের বাড়ি যাবেন কিন্তু যাওয়াটা হয়ে ওঠেনি। আনন্দী আজ এবং এখনই তার সঙ্গে লারউডকে নিয়ে যাবার জন্য জোরজার করতে লাগল।

'এই সপ্তাহের মধ্যে নিশ্চয়ই যাব—' লারউডের মুখ থেকে নতুন করে এ কথা আদায় করে তবে সে উঠল।

আনন্দীদাসের পর এলেন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট নরোনহা এবং মিসেস নরোনহা। মিসেস নরোনহার বয়স খুব বেশি না। বড় জোর ছাব্বিশ-সাতাশ। হাসি-খুশি আহ্লাদে ধরনের মেয়ে। চমৎকার কথা বলতে পারেন। তাঁকে দেখলেই ভালো লেগে যায়।

ওঁরা স্বামী স্ত্রী আসছে. রবিবার দুপুরে খাওয়ার নেমন্তন্ন করে গেলেন। মিসেস নরোনহা বার বার বলেছেন, 'যাবেন কিন্তু আঙ্কল। আবার ভুলে যাবেন না।'

লারউড হাসতে হাসতে বলেছেন, 'খাওয়ার কথা আমি ভুলি না। দেখবে ঠিক সময়ে হাজির হয়েছি।'

'আমরা সকাল বেলাতেই গাড়ি পাঠিয়ে দেব। আপনার কাছে বৃটিশ ইণ্ডিয়ার অনেক গল্প শুনব।'

'তোমাদের আর কষ্ট করে গাড়ি পাঠাতে হবে না। আমার ভোলা আছে। সে-ই নিয়ে যাবে।'

নরোনহারা চলে যাবার পর আরো কয়েকজন এলো। সবারই এক আর্জি। তাদের বাড়ি যেতে হবে।

সাতাশ বছর পরও এই শহর তাঁকে যে মনে করে রেখেছে, এ জন্য লারউড গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। এত মানুষের আন্তরিকতা, প্রীতি, শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা তাঁকে অভিভূত করে ফেলছিল।

শেষ লোকটা যখন চলে গেল তখন দুপুর। সামনের বারান্দায় পুরনো আমলের গ্র্যাণ্ডফাদার ক্লকটার কাঁটায় কাঁটায় বারোটা বাজল। লারউড তোয়ালে-টোয়ালে নিয়ে বাথরুমে ঢুকতে যাবেন, সেই সময় এ বাড়ির কাজের মেয়েটা ঘরে এসে ঢুকল। জানালো, একজন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চায়।

লারউড বললেন, 'কে ?'

'আমি চিনি না।'

'কোথায় সে ?'

'বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে।'

'যা, ডেকে নিয়ে আয়।'

মেয়েটা বেরিয়ে গেল। দু' মিনিট পরেই যাকে নিয়ে আবার ফিরে এলো তাকে দেখা মাত্র চিনে ফেললেন লারউড। লোকটা বিন্ধ্যাচলী সিং

বিন্ধ্যাচলীর বয়স এখন ছেষট্টি-সাতষট্টির মতো হবে। সাতাশ-আটাশ

বছর আগে যেমন দেখে গিয়েছিলেন তার থেকে লোকটা খুব একটা বদলায়নি। মাথার এখানে-ওখানে কোন অদৃশ্য মেক-আপ ম্যানের দু-এক পোঁচ সাদা রঙ টেনে দেওয়া আর চামড়ায় কিছু ভাঁজ পড়া ছাড়া প্রায় একই রকম আছে বিন্ধ্যাচলী। তবে তার পোশাক-টোশাকে রীতিমত পরিবর্তন ঘটে গেছে। আগের মতো ব্রিচেস বা লক্ষ্ণৌর কাজ করা কলিদার দামী রঙিন পাঞ্জাবি নেই পরনে। তার বদলে সাদাসিধে ধুতি আর মধ্যপ্রদেশী বেনিয়ান। পোশাকের মতো লোকটাও কি বদলে গেছে ভেতরে ভেতরে?

বিন্ধ্যাচলী দু' হাত তুলে বলল, 'নমস্তে—'

এই লোকটাকে এই মুহূর্তে আশা করেননি লারউড। নিজের অজান্তেই তাঁর চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। কী মতলবে লোকটা এসেছে, কে জানে। একটা হাত সামান্য তুলে প্রতিনমস্কারের ভঙ্গি করলেন লারউড। তারপর বললেন, 'বস বিন্ধ্যাচলী,—' ইণ্ডিয়া যখন বৃটিশ কলোনি তখন বিন্ধ্যাচলীকে নাম ধরেই বলতেন তিনি।

বিন্ধ্যাচলী বসল না একটু অবাক হয়ে বলল, 'আপনি আমাকে চিনতে পেরেছেন!'

'ইণ্ডিয়ার আর সব কিছুই ভুলতে পারি। তোমাকে ভোলা বোধহয় সম্ভব না। আমার ধারণা তুমিও আমাকে কোনদিন ভুলবে না।' লারউড বলতে লাগলেন, 'তুমি কী বল?'

বিন্ধ্যাচলীর মুখটা পলকের জন্য পাথরের মতো শক্ত হয়েই আবার নরম হয়ে গেল। সে বলল, 'আপনি সেই ঘটনাটা খুব সম্ভব ভুলতে পারেননি স্যর—'

বিন্ধ্যাচলী কোন্ ঘটনার কথা বলছে, লারউড তা জানেন। ভোলাকে মারার জন্য তার জেল খাটার ঘটনা। লারউড উত্তর দিলেন না।

বিন্ধ্যাচলী বলল, 'কদিন আগে শুনলাম আপনি এসেছেন। রোজই ভাবি আপনাকে একবার সেলাম জানিয়ে যাব। হাজার হোক, এককালে আমাদের প্রভু ছিলেন। কিন্তু নানা ঝামেলায় আসাটা আর হয়ে উঠ-

ছিল না। আজ সব ঝঞ্ঝাট একপাশে ঠেলে চলেই এলাম।'

লারউড বললেন, 'আমার সৌভাগ্য।'

বিন্ধ্যাচলী বলল, 'না স্যর, সৌভাগ্যটা আমার। ব্রিটিশ কলোনিয়াল ট্রাডিশান থেকে সেলাম ঠোকাটা শিখেছি তো। দেশ আজাদী হবার পরও ওটা ভুলতে পারিনি। সেলাম ঠুকতে দেরী হওয়ার জন্য মাফ করে দেবেন স্যর।'

লোকটার কথার মধ্যে শানানো বিদ্রূপ রয়েছে। যিনি তাকে এক সময় জেলে পুরেছিলেন নিশ্চয়ই তাঁকে ভক্তিবশত সেলাম ঠুকতে আসেনি বিন্ধ্যাচলী।

অবশ্যই তার বিশেষ একটা উদ্দেশ্য রয়েছে। আপাতত সেটা বোঝা যাচ্ছে না। সতর্ক ভঙ্গিতে লারউড বললেন, 'আমার আসার খবরটা কোথায় পেলে?'

'আমার ছেলে বুধোয়ারীর কাছে।'

'ও। ছেলেটা তোমার অত্যন্ত হারামজাদা হয়েছে। ওকে একটু সামলিও।'

'আপনার কথা আমার মনে থাকবে।'

একটু চুপচাপ। তারপর লারউড বললেন, 'এতদিন বাদে এ দেশে এসে একটা ব্যাপার দেখে ভীষণ মজা লাগল বিন্ধ্যাচলী।'

বিন্ধ্যাচলী জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার দেখে স্যর?'

'সারা দেয়ালে পোস্টার পড়েছে, তুমি ইলেকসানে নামছ। তোমার মতো একটা লোক পীপল্‌স রিপ্রেজেণ্টেটিভ হতে চাইছে, এ আমি ভাবতে পারি না।'

'মানুষ তো চিরকাল এক রকম থাকে না স্যর। আমি এখন দেশের সেবা করতে চাই।'

'তোমার কি ধারণা, তোমার যা ব্যাকগ্রাউণ্ড তাতে দেশের লোক লাফাতে লাফাতে এসে তোমাকে ভোট দিয়ে যাবে?'

'আমার ব্যাকগ্রাউণ্ড নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না। মানে ঘামাতে

সাহস করবে না। সাতাশ-আটাশ বছর আগে যে ইণ্ডিয়া দেখে গিয়েছিলেন সে ইণ্ডিয়া আর নেই। মানুষ অনেক বদলে গেছে। ভোটারদের নিয়ে আমার দুশ্চিন্তা নেই। কিন্তু স্যর আপনি যদি গোলমাল করেন—'

ভুরুতে ভাঁজ পড়ল লারউডের, 'মানে!'

বিন্ধ্যাচলী বলল, 'আপনার ক্যারেক্টার আমি জানি। অনেস্টি, রুল অফ ল—এই সব নিয়ে বড্ড বেশি ভাবেন। একটু এদিক ওদিক দেখলে অকারণে নাক ঢুকিয়ে দ্যান। তাই আপনার কাছে আর্জি—' বলতে বলতে হাতজোড় করল বিন্ধ্যাচলী, 'যখন এত বছর বাদে ইণ্ডিয়ায় এসেই গেছেন চুপচাপ থাকবেন। হাজার হোক, আপনি একজন ফরেনার, আমাদের গেস্ট, অত্যন্ত মাননীয় মেহ্‌মান। আপনার আরামের দিকটা আমাদের দেখা দরকার। যদি মনে করেন জঙ্গলে বেড়াতে যাবেন, হাতির ব্যবস্থা করব। শিকার করলে তারও অ্যারেঞ্জমেণ্ট করে দেব। যা চাই মুখ ফুটে একটু বলবেন স্যর। মনেপ্রাণে আমি এখনও স্যর আপনাকে সম্মান করি। একদিন আমার হাবেলিতে পায়ের ধুলোও দিতে হবে…' ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিন্ধ্যাচলী সমানে বকে যাচ্ছে। তার কথার ভেতর থেকে ছেঁকে যে সারটুকু বার করা গেল তা খুবই সরল। প্রচুর আরাম-স্বাচ্ছন্দ্য আর বিলাসের লোভ দেখিয়ে ইলেকসানের ব্যাপারটা থেকে বিন্ধ্যাচলী তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। তিনি বললেন, 'তোমার কথা আমার মনে থাকবে।'

'ধন্যবাদ স্যর, অনেক ধন্যবাদ। এই রবিবারের পরের রবিবার তাহলে শিকারের একটা ব্যবস্থা রাখি?'

'এর পরের রবিবার তো দেরি আছে। এত আগে থেকে প্রোগ্রাম ঠিক করতে হবে না। আমি তোমাকে পরে খবর দেব।'

'আচ্ছা স্যর।'

একটু ভেবে লারউড বললেন, 'তোমার জমিদারি কেমন চলছে?'

বিন্ধ্যাচলী বলল, 'জমিদারি তো এখন নেই। অনেক দিন আগেই

অ্যাবলিস হয়ে গেছে।'

লারউডের মনে পড়ল, কাগজে ভারতবর্ষে জমিদারি বিলোপের খবর পড়েছিলেন। বললেন, 'জমিদারি চলে গেল। তাহলে এখন তুমি কী করছ?'

বিন্ধ্যাচলী বলল, 'জমিদারিই করছি।' বলে অদ্ভুতভাবে হাসল।

লারউড অবাক হয়ে গেলেন, 'তার মানে?'

'স্যর, এতদিন পর এদেশে এলেন। বয়েসও যথেষ্ট হয়েছে। ঘুরুন, বেড়ান, আরাম করুন। এখানকার প্রবলেম নিয়ে ভেবে কী লাভ? আচ্ছা, আজ আসি স্যর। আমার হাভেলিতে নিয়ে যাবার জন্য শিগগির গাড়ি পাঠিয়ে দেব। নমস্তে—' হাঁটু পর্যন্ত ঘাড় নুইয়ে বিন্ধ্যাচলী চলে গেল।

আর বিমূঢ়ের মতো লারউড ভাবলেন, 'বিন্ধ্যাচলীর জমিদারিতে একবার যাবেন। জমিদারি অ্যাবলিসনের পরও কেমন করে লোকটা জমিদারি চালিয়ে যাচ্ছে, সেটা দেখার জন্য ভয়ানক কৌতূহল হচ্ছিল তাঁর।

১২

বিন্ধ্যাচলী চলে যাবার পর দারুণ এক অস্থিরতার মধ্যে স্নান করলেন লারউড, দুপুরের খাওয়া সারলেন। এমন কি শুয়েও পড়লেন। কিন্তু ঘুম এলো না। শুয়ে শুয়েই গ্র্যাণ্ডফাদার ক্লকে দুটো বাজার শব্দ শুনলেন লারউড।

আর তখনই প্রকাণ্ড জানলা দিয়ে দেখতে পেলেন সামনের রাস্তা পেরিয়ে বাড়ির কম্পাউণ্ডে ঢুকছে বিনায়ক। তার মানে আজ তার কলেজ খুব তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গেছে।

বিনায়ককে দেখতে দেখতে আচমকা বিদ্যুৎচমকের মতো একটা ভাবনা তাঁর মাথায় এসে গেল। বিছানা থেকে নেমে বড় বড় পা ফেলে

জানলার কাছে চলে গেলেন লারউড। ডাকতে লাগলেন, 'বিনয় বিনয়—'

বিনায়ক মুখ তুললেই তাকে তাঁর ঘরে আসতে বললেন। একটু পর সে এলে বললেন, 'প্রি-ইণ্ডিপেনডেন্স পীরিয়ডে ধমতোরিতে মুবারক আলি বলে একটা ঘোড়ার কারবারী ছিল। বলতে পারো সে কি এখনও বেঁচে আছে?'

সেই বৃটিশ আমলে মুবারক আলির ছিল ঘোড়া বেচাকেনার ব্যবসা। তা ছাড়া দু-একদিন কি দু-চারটে ঘণ্টার জন্যে ঘোড়া ভাড়াও দিত সে। তখন ধমতোরি শহর থেকে দেহাতে যাবার জন্য ভালো রাস্তা-টাস্তা ছিল না। মাঠের ওপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে হত। নইলে স্রেফ পায়ে হেঁটে। এ অঞ্চলের দেহাতগুলোতে পয়সাওলা লোক বলতে ছিল একমাত্র বিন্ধ্যাচলী। সে-ও টগবগে ওয়েলার ঘোড়া বা হাতিতে করে শহরে আসত। তার বাড়ির মেয়েরা আসত কারুকাজ-করা পালকিতে চড়ে। যাই হোক, প্রায় প্রতি সপ্তাহেই মুবারকের কাছ থেকে ঘোড়া ভাড়া করে দেহাতে যেতেন লারউড।

একটু ভেবে বিনায়ক বললে, 'আছে। মার্কেটের পিছন দিকে থাকে তো?'

লারউড বললেন, 'তখন তো তাই থাকত।'

'এখনও থাকে। তবে খুব বুড়ো হয়ে গেছে।'

'তা তো হবেই। আমি যখন চলে যাই তখন তার চুল পাকতে শুরু করেছে। মুবারক কি আজকের লোক!' বলে একটু হাসলেন লারউড। পরক্ষণেই আবার শুরু করলেন, 'এখনও কি ও ঘোড়ার কারবার করে?'

বিনায়ক বলল, 'করে। তবে নিজে আর পারে না। ছেলেরাই ব্যবসা গ্যাখে। নিজে বসে থাকে।'

লারউড বললেন, 'এখন তোমার কোন কাজ আছে?'

'না। কেন?'

'চল, একটু ঘুরে-টুরে আসা যাক।'

বিনায়ককে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরুতেই যথারীতি দেখা গেল ভোলা তার টাঙ্গা নিয়ে রাস্তায় বসে আছে। লারউডরা টাঙ্গায় উঠে মার্কেটের পিছন দিকে মুবারক আলির আস্তাবলে যেতে বললেন। দশ মিনিটের ভেতর ভোলা সেখানে পৌঁছে গেল।

টিনের ঝকঝকে বিরাট শেডের তলায় মুবারকের আস্তাবল। চল্লিশ-পঞ্চাশটা তেজী স্বাস্থ্যবান ঘোড়া সেখানে বাঁধা রয়েছে। তাদের গা থেকে তেল যেন গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে। আট-দশটা লোক বড় বড় প্লাস্টিকের বালতিতে ঘাসের কুচি আর ছোলার সঙ্গে ফ্যান মেখে ঘোড়াগুলোকে খাওয়াচ্ছে।

সাতাশ-আটাশ বছর আগে এত ঘোড়া, এত বড় টিনের শেড বা এত কাজের লোক ছিল না। সামান্য তিন-চারটে ঘোড়া নিয়ে ছোট্ট টিনের চালায় কারবার শুরু করেছিল মুবারক আলি।

যাই হোক, আস্তাবলের গা ঘেঁষে একটা ঘরে অফিস। তার মাথায় লেখা আছে মুবারক আলি অ্যাণ্ড সন্স।

অফিসটা টেবল চেয়ার দিয়ে সাজানো। সেখানে ঢুকতেই মুবারককে দেখতে পেলেন লারউড। এক সময় টকটকে রঙ ছিল মুবারকের। চামড়া কুঁচকে এখন রঙটা সোনার জালি জালি মনে হয়। পিঠটা অনেকখানি বেঁকে গেছে। মাথাটা একেবারে ধবধবে, একটা চুলও সেখানে কালো নেই। পরনে ঢোলা পাজামা আর ফুল-শার্ট, মাথায় টুপি, চোখে পুরু লেন্সের চশমা।

দেখামাত্রই লারউডকে চিনতে পারল মুবারক। সসম্ভ্রমে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম করল। তারপর লারউডের একটা হাত ধরে নিজে চেয়ারটায় বসাল। বিনায়ককে চেনে সে; তাকেও আদর করে অন্য একটা চেয়ারে বসাল। তারপর লারউডের কাছে এসে একের পর এক প্রশ্ন করে যেতে লাগল—বড়ে সাহাব কবে ধর্মতোরিতে এসেছেন, কোথায় উঠেছেন, কতদিন থাকবেন? অত্যন্ত অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলল,

মেহেরবানি করে একদিন তার গরীবখানায় যেতে হবে···ইত্যাদি ইত্যাদি।

লারউড তার প্রতিটি কথার উত্তর দিয়ে গেলেন এবং জানালেন নিশ্চয়ই একদিন তাদের বাড়ি যাবেন। এরপর মুবারকের খবর-টবর নিলেন লারউড। খোদার দোয়ায় সে খুব খারাপ নেই। ব্যবসা ভালোই চলছে। তিন ছেলে রমজান, ওসমান, রহমান ব্যবসা ছাখে। ছেলেদের বিয়ে দিয়েছেন, বৌরা বেশ ভালো, সবাই মিলে মিশে ঘর-সংসার করছে। জীবনে একটা ইচ্ছাই এখনও পূর্ণ হয়নি। একবার হজে যেতে হবে। আল্লাহর করুণা হলে আসছে বছরই সে যেতে চায়।

নিজের যাবতীয় পারিবারিক খবর দেবার পর ছেলেদের ডেকে লারউডের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল মুবারক। ছেলেরা আস্তাবলে ঘোড়াদের খাওয়ানো তদারক করছিল। আলাপ পরিচয় ইত্যাদির পর লারউড বললেন, 'তোমার ঘোড়া এখনও ভাড়া দাও?'

মুবারক বলল, 'নিশ্চয়ই দিই। ওটাই তো আমার ব্যবসা।'

'ঘণ্টা চারেকের জন্য আমার দুটো ঘোড়া চাই।'

'জরুর। ঘোড়াগুলো খাচ্ছে। খাওয়া হলে নিয়ে যান।'

'কত ভাড়া দেব?'

তাড়াতাড়ি জিভ কেটে কানে হাত দিয়ে মুবারক বলল, 'হুজুর, আপনার কাছ থেকে ভাড়া নিতে পারব না। আমাকে মাফ করবেন।'

মুবারক ভাড়া নেবে না, লারউড দেবেনই। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, আজ ভাড়া নেবে না। এরপর ঘোড়া নিলে নেবে।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে লারউড দ্রুত বিনায়কের দিকে মুখ ফেরালেন। বললেন, 'ঐ ছাখ, দুটো ঘোড়ার অ্যারেঞ্জমেণ্ট তো করে ফেললাম, কিন্তু তুমি হর্স রাইডিং জানো কিনা সেটাই জানি না।'

বিনায়ক বলল, 'জানি।'

'ফাইন।'

'কিন্তু ঘোড়ায় চেপে কোথায় যাবেন?'

'গেলেই সেটা বুঝতে পারবে।'

অসীম কৌতূহল নিয়ে বসে রইল বিনায়ক। সে আর কোন প্রশ্ন করল না।

মিনিট পনেরোর ভেতর ঘোড়াদের খাওয়ানো হয়ে গেল। তারপর মুবারক নিজে আস্তাবলে গিয়ে দুটো ঘোড়া বেছে সেগুলোর পিঠে যত্ন করে জিন আর মুখে লাগাম পরাল। তারপর ঘোড়া দুটো লারউডকে দিয়ে বলল, 'এই দুটো আমার সেরা ঘোড়া ; খুব শান্তও। নিয়ে যান বড়ে সাহাব।'

ঘোড়া নিয়ে বাইরে এসে লারউড ভোলাকে বললেন, 'তুই আজ চলে যা। আমরা ঘোড়ায় করে একটু বেড়াব।'

'জী হুজুর। আমি কাল সবেরে শুক্লাজীর বাড়ি হাজির থাকব।' ভোলা টাঙ্গা নিয়ে চলে গেল। লারউড বিনায়ককে একটা ঘোড়ায় চড়তে বলে নিজে আরেকটায় উঠলেন।

কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, দুই ঘোড়সওয়ার শহর ছাড়িয়ে পুবদিকের উঁচু-নীচু সীমাহীন মাঠের মাঝখানে এসে পড়েছে।

বিনায়ক জিজ্ঞাসা করল, 'এবার বলবেন কোথায় যাচ্ছি?'

লারউড বললেন, 'বিন্ধ্যাচলীর জমিদারিতে।'

'ও, আচ্ছা—'

'পুরনো দেহাতগুলো কিরকম রয়েছে, সেখানকার লোকজন কিভাবে দিন কাটাচ্ছে, জানবার ভীষণ ইচ্ছা হচ্ছিল।'

বিনায়ক বলল, 'তার জন্যে ঘোড়ায় করে আসার কী দরকার ছিল। এদিকে এখন অ্যাসফাল্টের রাস্তা হয়েছে। ভোলার টাঙ্গায় এলেই তো হত। এই বয়েসে হর্স রাইডিং করে টায়ার্ড হয়ে যাবেন যে।'

লারউড বললেন, 'টায়ার্ড হব না। সাতাশ-আটাশ বছর আগে আমি যখন এখানকার ডি. এম. তখন ঘোড়ায় করেই দেহাতে যেতাম। একবার মনে হয়েছিল, এদিকে নিশ্চয়ই রাস্তা-টাস্তা তৈরি হয়েছে। তবু পুরনো দিনের মতো ঘোড়ায় চেপেই এদিকে আসতে ইচ্ছা করল।'

বিনায়ক সামান্য হাসল। বলল, 'এবার বোঝা গেল।

যে রাস্তার ওপর দিয়ে ওরা এখন চলেছে সেটা সোজা দিগন্তে গিয়ে মিশেছে। দু' ধারে লাল মাটির উঁচু-নীচু কর্কশ মাঠ। মাঠে ঝোপঝাড়, কাঁটাগাছের জঙ্গল। ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট গাঁ আর চাষের জমি।

এই রাস্তাটাকে বাদ দিলে সাতাশ-আটাশ বছর আগে লারউড যা দেখে গিয়েছিলেন এখানকার দৃশ্যপট প্রায় সেই রকমই রয়েছে।

এই মুহূর্তে সূর্যটা পশ্চিম আকাশের ঢালু গা বেয়ে গড়াতে গড়াতে অনেকখানি নিচে নেমে একটা সোনালী বলের মতো আটকে রয়েছে। সব মিলিয়ে মধ্যপ্রদেশের এই জায়গাটা যেন একখানা অলৌকিক ছবির মতো।

আশেপাশে লোকজন বিশেষ চোখে পড়ছে না। কচিৎ কখনো দু-একটা দেহাতী মানুষ, এক-আধটা টাঙ্গা বা লং ডিসট্যান্স রুটের বাস পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

শেষ বেলার রোদ আর হাওয়া গায়ে মেখে নির্জন মাঠের ভেতর দিয়ে ঘোড়ায় চেপে যেতে ভালো লাগছিল লারউডের। সাতাশ-আটাশ বছর আগের সেই আশ্চর্য রমণীয় নস্টালজিয়ার মধ্যে দিয়ে এক অপার্থিব ঘোড়-সওয়ার হয়ে যেন এগিয়ে যাচ্ছিলেন। দূরে পাখির ঝাঁক দেখতে দেখতে লারউড বললেন, 'এই রাস্তাটা হওয়াতে যাতায়াতের বেশ সুবিধে হয়েছে।'

বিনায়ক পাশ থেকে বলল, 'হ্যাঁ।'

এদিককার মাঠ-ঘাট সবই লারউডের মুখস্থ। এতকাল পরও কিছুই তিনি ভুলে যাননি। রাস্তাটা যেদিক দিয়ে গেছে সেদিক দিয়ে গেলে বিন্ধ্যাচলী সিং-এর জমিদারিতে যেতে অন্তত তিন মাইল বেশি ঘুরতে হবে। মাঠ বরাবর গেলে অনেক আগেই সেখানে পৌছনো যাবে।

আরো খানিকটা যাবার পর লারউড বললেন, 'চল, শর্টকাট করা যাক।' দুজনে ঘোড়া নিয়ে মাঠে নেমে পড়লেন।

বিন্ধ্যাচলী সিং-এর পুরনো দিনের সেই জমিদারিতে লারউডরা যখন পৌছলেন তখন যথেষ্ট রোদ রয়েছে। সূর্যটা অবশ্য অনেক দূরের পাহাড়ী

রেঞ্জের ওধারে আরো খানিকটা নেমে গেছে।

এখানে মাইলের পর মাইল জুড়ে চাষের জমি। গমের খেত, ধানের খেত, আখের খেত। ঝোপঝাড় বা জঙ্গল বিশেষ চোখে পড়ে না। ফাঁকে ফাঁকে পাথর, টিন আর কাঠ দিয়ে তৈরি ছোট ছোট ঘর। এই রকম চল্লিশ-পঞ্চাশটা ঘর নিয়ে একেকটা গরীব গাঁ। গাঁ-গুলো চাষের জমির মধ্যে এলোমেলো ছড়িয়ে আছে। সাতাশ বছর আগে লারউড যা দেখে গিয়েছিলেন অবিকল তেমনই রয়েছে জায়গাটা। এতদিনে কোন রকম পরিবর্তন হয়নি।

এই মুহূর্তে অগুনতি লোক চারপাশের চাষের জমিগুলোতে কাজ করছিল। হঠাৎ দুই অচেনা ঘোড়-সওয়ারকে, বিশেষ করে একজন ধবধবে সাদা সাহেবকে দেখে তারা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। লারউডও ওদের চিনতে পারছিলেন না। দীর্ঘ সাতাশ বছরে পুরনো জেনারেশানের কেউ কি আর বেঁচে আছে ?

ক্ষেতের ভেতর দিয়ে সরু সরু পায়ে চলার পথ। আস্তে আস্তে ঘোড়া চালিয়ে যেতে যেতে কিষাণদের সঙ্গে নানা কথা বলছিলেন লারউড।

হঠাৎ ওধারের জনারের ক্ষেত থেকে একটা বুড়ো দৌড়তে দৌড়তে উঠে এলো। লোকটার মাথায় পাগড়ি, চোখ ঘোলাটে, সারা গায়ের চামড়া কোঁচকানো, খাপচা খাপচা দাড়ি পেকে সাদা হয়ে গেছে। লারউডের কাছে এসে চোখের ওপর হাতের আড়াল দিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে তাঁকে দেখল বুড়ো লোকটা। তারপর হাঁটু পর্যন্ত মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, 'নমস্তে বড়ে সরকার। নমস্তে মা-বাপ।'

লোকটাকে চিনতে পারলেন না লারউড। তবু বললেন, 'নমস্তে। তোমার নামটা যেন কী ?'

'দুসাদী। সেই যে ভোলা—যাকে আপনি শহরে নিয়ে গিয়ে টাঙ্গা কিনে দিয়েছিলেন সে আমার ভাতিজা।'

এবার আবছা ভাবে মনে পড়ে গেল। লারউড জিজ্ঞেস করলেন,

'ভালো আছ তোমরা ?'

'আপকা কিরপা—'

'দেশ তো আজাদী হয়ে গেছে। তোমরা আগে বিন্ধ্যাচলীর ক্ষেতিতে পেট-ভাতায় চাষ করতে। এখন নিশ্চয়ই নিজের জমি-টমি পেয়ে গেছ—'

'পেয়েছিলাম সরকার। লেকেন ও জমি আমাদের নয়। এখনও আমরা সিংজীর জমিতেই খাটছি।'

'তোমার কথা বুঝতে পারছি না।'

তুসাদী যা উত্তর দিল তা এইরকম। সে কিছুদিন আগে শুনেছিল, জমিদারি আর থাকছে না। এখন ভূমিহীন কিষাণেরা জমি-টমি পাবে। জমিদারি চলে যাবার ঠিক মুখে মুখে বিন্ধ্যাচলী তাদের ডেকে মিঠে কথায় বলেছিল, অনেক দিন ধরে সেই বাপ-দাদার আমল থেকে তোরা আমার জমিতে খাটছিস। এবার তোদের নামে আমি জমিগুলো লিখে দেব। লেকেন মুফতে তো দেওয়া যায় না। সরকার সন্দেহ করবে। কিছু দাম তোরা দিবি। দামের কথায় তুসাদীরা দমে গিয়েছিল। বলেছিল, লেকেন সরকার, আমরা রুপেয়া পাব কোথায় ? বিন্ধ্যাচলী বলেছিল, তার জন্য শোচতে হবে না। কিছুদিন বাদে রেজিস্ট্রি করে সত্যি সত্যিই জমি দিয়েছিল বিন্ধ্যাচলী। সেই সঙ্গে স্ট্যাম্প কাগজে কয়েক শো টাকার ঋণ লিখিয়ে দলিলগুলো নিজের কাছে রেখে দিয়েছিল। চক্রবৃদ্ধিসুদসমেত ঋণ তারা যেদিন শোধ করবে সেদিনই দলিল ফেরত পাবে। প্রথমটা তারা উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল কিন্তু পরে বেশ কয়েক বছর কাটবার পর বুঝেছে, নামেই তারা জমির মালিক হয়েছে, আসলে আগেও যা ছিল তা-ই থেকে গেছে। সেই ভূমিহীন পেট-ভাতার কিষাণ।

সেদিন বিন্ধ্যাচলী জানিয়েছিল, জমিদারি বিলোপ হয়ে গেলেও সে জমিদারি চালিয়ে যাচ্ছে। কথাটার অর্থ আজ পরিষ্কার হয়ে গেল। লারউড বললেন, 'যাও, তোমরা কাজ কর গিয়ে—'

সবাই আবার ক্ষেতে গিয়ে নামল। লারউড এগিয়ে যেতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। এক সময় লারউড আস্তে আস্তে বললেন, বিন্ধ্যাচলী লোকটা কত বড় এক্সপ্লয়টার কত বড় শয়তান, দেখেছ বিনয়?

বিনায়ক এই কথাই ভাবছিল। বলল, 'হুঁ'। এ কল্পনা করা যায় না।

লারউড বললেন, 'আমার ভয় হচ্ছে ভারতবর্ষের অন্যান্য গাঁগুলোতে এই রকম এক্সপ্লয়টেশন চলছে কিনা—তুমি তো ইকনমিক্সের অধ্যাপক। রুরাল ইণ্ডিয়ার খবর রাখো?'

বিনায়কের শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎচমকের মতো কিছু একটা খেলে গেল। কিছুটা ভয়ে ভয়েই সে বলল, 'না, মানে গ্রাম-গুলোতে ঠিক যাওয়া হয় না। নানা রকম কাজে—'

লারউড বললেন, 'এটা কোন এক্সকিউজ নয়। ইণ্ডিপেনডেন্সের পর দুটো জেনারেসন গ্যাপ ঘটে গেছে। তবু বিন্ধ্যাচলী সিং-এর মতো লোক মানুষকে এক্সপ্লয়েট করে চলেছে। শুধু তাই না, সে পলিটিক্যাল পাওয়ারের জন্য ইলেকশানে নামতে চাইছে। ভাবতে পারিনি ইণ্ডিয়ায় এসে এ সব দেখব।'

বিনায়ক উত্তর দিল না। তার মধ্যে উল্টোপাল্টা ঘূর্ণি হাওয়ার মতো অনবরত কিছু একটা ঘুরে যাচ্ছিল। ধমতোরি শহর থেকে মাত্র সাত মাইল দূরে কী ঘটে চলেছে সে সম্বন্ধে তার কোন ধারণাই ছিল না এতদিন। লারউড এসে আচমকা যেন তার চোখ ফুটিয়ে দিয়ে গেলেন। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে তাকে নতুন করে ভাবতে হবে।

লারউড বললেন, 'একটা কথা ভেবে খুব অবাক হয়ে যাচ্ছি বিনায়ক।'

বিনায়ক জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল, 'কী?'

'ধমতোরি শহর থেকে মাত্র সাত-আট মাইল দূরে একটা বদমাস লোক বছরের পর বছর কতগুলো দুর্বল নিরীহ মানুষের রক্ত শুষে খাচ্ছে। অথচ ইকনমিক্সের লোক হয়ে তুমি তার কোন খোঁজই রাখো না। দিস ইজ ক্রাইম।'

বিনায়ক ঘাড় নীচু করে অপরাধীর মতো মুখ করে বলল, 'আমি স্বীকার করছি।'

লাবউড বললেন, 'অর্থনীতির কতকগুলো থিওরি মুখস্থ করে এম. এ-টা পাস করেছ। এখন নতুন জেনারেসনের মাথায় আবার সেই সব থিওরি স্টোর করে যাচ্ছ। এতে দেশ কিন্তু এগুবে না। তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া কী?'

একটু ভেবে লারউড বললেন, 'আজ থাক; আরেকদিন বলব।'

১৩

কথা বলতে বলতে ক্ষেতের জমির ভেতর দিয়ে কখন যে লারউডরা দক্ষিণে অনেক দূর চলে গিয়েছিল খেয়াল নেই। হঠাৎ পাথরের একতলা বাড়িটা চোখে পড়ল। এক সময় ওটা বিন্ধ্যাচলী সিং-এর কাছারি ছিল। আর সামনে কুয়োর কাছে এই মুহূর্তে অচ্ছুৎ কিষাণদের ভিড় লেগে আছে।

কিষাণরা একধারে অ্যালুমিনিয়ামের লোটা-টোটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর একটা লোক কুয়ো থেকে জল তুলে তুলে অনেক উঁচু থেকে পাত্রগুলোতে ঢেলে দিচ্ছে। সাতাশ-আটাশ বছর আগেও এখানে এই দৃশ্যই দেখে গেছেন লারউড। অর্থাৎ ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারটা এখনও রয়েছে। স্বাধীন ভারতে পরাধীন ভারতের জঘন্য সেই ট্রাডিসান সমানে চলছে।

কুয়োর পাশ দিয়ে লারউডরা আরো দক্ষিণে এগুতে লাগলেন।

আকাশের গা থেকে দিনের শেষ রক্তাভাটুকু দ্রুত মুছে যাচ্ছে। দূরে পাহাড়ের রেঞ্জে মিহি চিনির দানার মতো গুঁড়ো গুঁড়ো হিম পড়তে শুরু করেছে। লারউড বললেন, 'সন্ধ্যে হয়ে আসছে। চল, এবার ফেরা যাক।'

তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই বহু দূর থেকে অনেকগুলো মেয়ে-

গলার ভীত চিৎকার শোনা গেল। চমকে এধারে ওধারে তাকাতেই লারউড দেখতে পেলেন পূবদিকে একটা উঁচু টিলার মাথা থেকে অনেক-গুলো মেয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো দৌড়ুতে দৌড়ুতে নেমে আসছে। তাদের সবার মাথায় বা হাতে জলের পেটমোটা কলসী।

লারউড জানেন, ঐ টিলার ওধারে একটা পাহাড়ী নদী রয়েছে। এদিকের দেহাতী মেয়েরা সেখান থেকে জল আনতে যায়। কিন্তু মেয়েগুলোর ঐ রকম ভীতভাবে ছোটাছুটি আর চিৎকারের কারণটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

লারউড ঘোড়ার মুখটা টিলার দিকে ঘুরিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'চল তো, কী হয়েছে দেখে আসি।'

বিনায়কও ব্যাপারটা জানার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল। ঘোড়ার মুখ সেও ঘুরিয়ে দিল।

তিন-চার মিনিটের মধ্যে বড় বড় গ্যালপ তুলে দুটো তেজী ঘোড়া লারউড আর বিনায়ককে টিলার নিচে মেয়েগুলোর কাছে নিয়ে এলো।

লারউড লাগাম টেনে ঘোড়া থামাতে থামাতে মেয়েদের জিজ্ঞেস করলেন, 'এই, কী হয়েছে রে? অমন করে ছুটছিস কেন?'

মেয়েগুলো দুই ঘোড়সওয়ার, বিশেষ করে একজন সাহেবকে দেখে হকচকিয়ে থেমে গিয়েছিল। পরক্ষণেই বুঝতে পেরেছিল এই মানুষটিকে ভয় পাবার কিছু নেই। ভীতভাবে টিলার দিকে আঙুল বাড়িয়ে তারা বলল, 'ঐ যে—'

লারউডরা তাকিয়ে দেখলেন, টিলার মাথায় একটা ঘোড়া কখন যেন এসে দাঁড়িয়েছে। তার পিঠে বুধোয়ারি সিং। কয়েক মুহূর্ত বুধোয়ারি হিংস্র চোখে লারউডের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর কুৎসিত গালা-গাল করে ওধারের ঢালে নেমে গেল। তার মানে বুধোয়ারি লারউডকে চিনতে পেরেছে এবং এই মানুষটিকে ভয়ও পেতে শুরু করেছে।

লারউড আগেই টের পেয়েছিলেন এবং আজও বুঝতে পারলেন দূর থেকে খিস্তিখেউড় করা ছাড়া ক্ষতি করার কোন ক্ষমতাই ওর নেই।

একেবারে কাওয়ার্ড, নপুংসক।

এদিকে বুধোয়ারি চলে যাবার পর ভয়ার্ত মেয়েগুলো এতক্ষণে খানিকটা স্বাভাবিক হতে পারল যেন। ভয়ের ভাবটা তাদের অনেকখানিই কেটে গেছে। লারউডের জন্যই যে বুধোয়ারি পালিয়ে গেল সেটা বুঝতে পারছিল মেয়েগুলো। তাদের চোখেমুখে এই অচেনা বিদেশীর জন্য অসীম কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠতে লাগল।

লারউড বললেন, 'ঐ লোকটা কী করছিল?'

প্রথমে কেউ মুখ খুলবে না। লারউড বার বার জিজ্ঞেস করার পর একটা মেয়ে বলল, 'উও আদমী বহোত খাতারনাক, হারামী।'

এরপর অন্য মেয়েগুলোও বুধোয়ারি সম্পর্কে বলতে লাগল। এ রকম হাড় বজ্জাত শয়তান আদমী আর হয় না। দেহাতের যুবতী মেয়েরা যখন পাহাড়ী নদীতে জল আনতে যায় তখন প্রায়ই বুধোয়ারি ঘোড়া ছুটিয়ে তাদের পেছনে এসে লাগে এবং জোর করে তাদের কাউকে না কাউকে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে যায়। পরের দিন মেয়েটা যখন ফিরে আসে তখন তার সর্বনাশ ঘটে গেছে। যেমন হয়েছে লখিয়ার, মাদারীর কিংবা আরো অনেকের।

শুনতে শুনতে চমকে উঠছিলেন লারউড। তাঁর জানা আছে, ফিউডাল সিস্টেমেই এ ধরনের ব্যাপার হওয়া সম্ভব। কিন্তু যে দেশে জমিদারি প্রথা অ্যাবলিসন হয়ে গেছে সেখানে কেমন করে বিন্ধ্যাচলী সিং-এর ছেলে বুধোয়ারি এতটা সাহস পাচ্ছে, কে জানে। তবে কি এই স্বাধীন ভারতবর্ষে নতুন করে পুরনো বর্বর মধ্যযুগ ফিরে এল? ইতিহাসের চাকা সামনের দিকে এগুবার বদলে ঘুরতে ঘুরতে পেছন দিকে যাচ্ছে? গভীর বিষাদে তাঁর মন ভরে যেতে লাগল।

লারউড মেয়েদের দিকে ফিরে বললেন, 'যা, তোরা ঘরে যা। আমি আছি, কিচ্ছু ভয় নেই।

মেয়েগুলো জানালো, লারউড না এসে পড়লে আজ তাদের কারো না কারো ক্ষতি হয়ে যেত। ভগোয়ান তাঁর ভালো করবেন।

মেয়েগুলো চলে যাবার পর লারউড বিনায়ককে বললেন, 'কী দেখলে ?'

বিনায়ক স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল, 'এ আমি ভাবতে পারি না। এ সব ব্যাপার এতকাল ফিল্মেই দেখেছি।'

'তোমার শহর থেকে মাত্র সাত মাইল দূরে 'মিডিয়াভ্যাল এজ' রাজত্ব করছে।'

'তাই তো দেখছি।'

'দেশটাকে একটু ভালো করে দেখ।' বলে কিছুক্ষণ কী ভাবলেন লারউড। ক্রমশ তাঁর চোয়াল শক্ত হয়ে উঠতে লাগল। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ এবং স্থির। এক সময় তিনি বললেন, 'চল—'

'কোথায় ?'

'বিন্ধ্যাচলী সিং-এর বাড়িতে।'

বিনায়ক চমকে উঠল, 'সেখানে কেন ?'

'চলই না—' লারউড ঘোড়ার পিঠে আস্তে করে ছপটির ঘা মারলেন।

অগত্যা বিনায়ককেও ঘোড়া ছোটাতে হল। তবে ভেতরে ভেতরে এক ধরনের উৎকণ্ঠা আর উত্তেজনা অনুভব করতে লাগল সে।

উত্তর দিকে বড় একটা টিলার মাথায় প্রায় দু একর জায়গা জুড়ে বিন্ধ্যাচলী সিং-এর প্রকাণ্ড তেতলা বাড়ি। সামনের দিকে বিরাট কম্পাউণ্ড। সেখানে পুরনো আমলের ফোর্ড থেকে শুরু করে হাল আমলের জাপানী টয়োটা পর্যন্ত পাঁচ-ছটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আর আছে গোটা দুই হাতী, সাত-আটটা ওয়েলার ঘোড়া। কয়েকটা বয়েল গাড়ি আর ফীটনও এধারে ওধারে ছড়িয়ে রয়েছে।

এই মুহূর্তে একটা হাতীর পিঠে হাওদা চড়ানো হচ্ছিল। আর কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার তদারক করছিল বিন্ধ্যাচলী সিং স্বয়ং। খুব সম্ভব এই হাতীটায় চেপে সে কোথাও বেরুবে। হঠাৎ ঘোড়া ছুটিয়ে এই

মুহূর্তে লারউড আর বিনায়ককে আসতে দেখে সে খুব অবাক হয়ে গেল।

লারউডরা বিন্ধ্যাচলীর কাছাকাছি এসে ঘোড়া থামিয়ে দিয়েছিলেন।

বিন্ধ্যাচলী কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'স্যর আপনি! একটু থেমে অত্যন্ত ব্যস্তভাবে ফের বলল, 'আসুন আসুন। এই গরীবখানায় আপনার পায়ের ধূলো পড়বে, এ আমি ভাবতেও পারিনি। আমার বহোত বহোত পুণ্য—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে লারউড বললেন, 'আমাদের এখনই শহরে ফিরে যেতে হবে বিন্ধ্যাচলী। নামতে পারব না।'

'আপনি মেহমান। একটু জিরিয়ে এক গিলাস শরবত না খেয়ে গেলে আমার বহোত খারাপ লাগবে।'

'শরবত খাবাব জন্যে আসিনি। তোমার কাছে একটা জরুরী কাজ আছে।'

'নফরকে ফরমাস করুন—' বশংবদ ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল বিন্ধ্যাচলী।

বুধোয়ারির ব্যাপারটা দু-চার কথায় জানিয়ে লারউড বললেন, 'তুমি তো পীপল্স রিপ্রেজেণ্টেটিভ হতে যাচ্ছ; আর তোমার ছেলে এই রকম বদমাইসি করে চলেছে। তা ছাড়া তুমি কি ভাবে জমিদারি অ্যাবলিসনের পরও জমিদারি চালিয়ে যাচ্ছ, তাও আমি জানতে পেরেছি। এভাবে চালিয়ে তুমি পীপলের ভোট পাবে? কথাটা ভেবে দেখেছ?'

রাগে চোখ মুখ হিংস্র রক্তবর্ণ হয়ে উঠতে যাচ্ছিল বিন্ধ্যাচলীর। মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলল, 'আপনি আমার কথা যে ভেবেছেন সে জন্য বহোত বহোত সুক্রিয়া। চিন্তা করবেন না, ভোট আমি পাবই। বুধোয়ারির কথা আমি শুনেছি। ঠিক করেছি ভোটের ক'দিন আগে অচ্ছুৎ দেহাতাদের ডেকে সবার সামনে চাবকে শুয়ারকা বাচ্চাটার পিঠের ছাল আমি তুলে ফেলব। আর ডিক্লেয়ার করব দু' বছরের জন্য কিষাণদের সব সুদ মুকুব। তারপরও আরেকটা কাজ করব—ভোটের আগের দিন একটা পাইকিরি ভোজ দিয়ে দেব। আমি আর আমার ফ্যামিলির সবাই তাদের সঙ্গে বসে খাব। খাওয়া হয়ে যাবার পর সবাইকে দুটো

করে টাকা দেব সিনেমা দেখার জন্যে। আপনি যদি ততদিন থাকেন, দেখবেন সব ভোট আমার বাক্সেই পড়ছে। পীপল্ নিয়ে জন্মের পর থেকে ঘাঁটাঘাঁটি করছি। ওদের সাইকোলোজিটা আমি জানি স্যর। আপনি এ ব্যাপারে চিন্তা করবেন না।' একটু থেমে আবার বলল, 'লেকেন আপনাকে সেদিন একটা কথা বলেছি, আজও আবার সেটা মনে করিয়ে দিতে চাই।'

'কী কথা?'

'আপনি আমাদের গেস্ট, মেহমান। আপনি কেন এদেশের ভোট-ফোট নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন?'

'আমি একজন মানুষ বিন্ধ্যাচলী। পৃথিবীর যেখানেই যাই মানুষের কথা ভাবতে হবে বৈকি। আচ্ছা চলি।'

'নামলেন না, বাড়িতে পায়ের ধুলো পড়ল না। আমার বহোত বুরা (খারাপ) লাগছে। যাক গে, আমার ইচ্ছা একদিন দয়া করে গরীব-খানায় ভোজন করেন। তারপর শিকারে—'

এ সব কথা আগেই বলে এসেছিল বিন্ধ্যাচলী। লারউড বললেন, 'আমি তো আছিই ক'দিন। পরে দেখা যাবে—'

১৪

পরের দিন রবিবার। আজ ধমতোরি শহরের মাঝখানে টাউন ক্লাবের মাঠে বিন্ধ্যাচলী সিং-এর ইলেকসান মীটিং। বিন্ধ্যাচলীর কনস্টিটিউয়েন্সির খানিকটা পড়েছে দেহাতগুলোতে, বাকিটা শহরের কিছুটা অংশ জুড়ে।

বিকেল চারটেয় মীটিং। সকাল থেকেই বিন্ধ্যাচলীর নির্বাচনী এজেন্টরা সাইকেল-রিক্শায় করে মাইকে মাইকে অনবরত মীটিং-এর কথা বলে গেছে।

'আপনারা সবাই দলে দলে মীটিং-এ আসুন—'

'বিন্ধ্যাচলী সিংজী এবার আপনাদের প্রতিনিধি হয়ে বিধান সভায়

যাচ্ছেন। তিনি আপনাদের কাছে আজ ভোট প্রার্থনা করবেন।'

এই মীটিংটা সম্পর্কে লারউডের প্রথম থেকেই ভীষণ কৌতূহল ছিল। এককালের দুর্দান্ত লম্পট, টাইর‍্যান্ট টাইপের এক ফিউডাল লর্ড ডেমোক্রেটিক সেট-আপে রাজনীতিক ক্ষমতা পাওয়ার জন্য জন-সাধারণের কাছে কী বক্তব্য রাখে, সেটা জানার খুবই ইচ্ছা লারউডের।

চারটের কিছু আগে আগেই নারায়ণদাস আর বিনায়ককে নিয়ে মীটিং-এর জায়গায় চলে এলেন লারউড।

টাউন ক্লাবের মাঠে প্রচুর লোকজন হয়েছে। চারদিকে বাঁশের খুঁটি পুঁতে সেগুলোর গায়ে অ্যামপ্লিফায়ার বেঁধে দিয়েছে ডেকরেটরের লোকেরা। সামনের দিকে সুসজ্জিত বিরাট উঁচু মঞ্চ।

কাঁটায় কাঁটায় চারটেয় বিন্ধ্যাচলী সিং চার-পাঁচজন গম্ভীর চেহারার প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধকে নিয়ে মঞ্চে এসে উঠল। বিন্ধ্যাচলীর সঙ্গীদের একজন এখানকার একটা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। দেখামাত্রই তাঁকে চিনে ফেললেন লারউড। বৃটিশ আমলে ভদ্রলোক ছিলেন সামান্য লেকচারার। বাকি দুজনের একজন এখানকার বার লাইব্রেরির প্রেসিডেণ্ট, তৃতীয় ব্যক্তি রিটায়ার্ড গভর্নমেণ্ট অফিসার। প্রিন্সিপ্যাল ছাড়া বাকি দুজন লারউডের অচেনা। তবে নারায়ণদাস তাঁদের পরিচয় দিয়ে দিলেন। বিন্ধ্যাচলীর মতো একটা মার্কামারা ফিউডাল সিস্টেমের ঘাগী বজ্জাত কী করে কলেজের প্রিন্সিপ্যাল বা বার লাইব্রেরির প্রেসিডেণ্টের মতো লোকদের জোটাতে পারল সেটাই এক আশ্চর্য ব্যাপার।

যাই হোক, এই মীটিং-এ সভাপতি হলেন প্রিন্সিপ্যাল, প্রধান অতিথি বার লাইব্রেরির প্রেসিডেণ্ট আর বিশেষ অতিথি রিটায়ার্ড গভর্নমেণ্ট অফিসারটি। তাঁদের মালা পরানো, জনগণের হাততালি ইত্যাদির পর বক্তৃতা শুরু হল। বিশেষ অতিথি এবং প্রধান অতিথির বক্তৃতার পর সভাপতির ভাষণ। একবারে শেষে বিন্ধ্যাচলী সিং তার কথা বলবে।

সভাপতি, প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি একই কথা বললেন।

বিন্ধ্যাচলী সিং এ-অঞ্চলের বিখ্যাত মানুষ। বিশ-পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে এমন কেউ নেই যে তাকে চেনে না। এখানকার জনহিতকর সব কিছুর সঙ্গে তার যোগ রয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে সবাইকে সে চেনে। জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করতে গেলে তার চাইতে যোগ্য ব্যক্তি এখানে পাওয়া যাবে না। এরকম সমাজ-হিতৈষী, জনদরদী পরোপকারী এবং দেশের সেবায় উৎসর্গীকৃত মানুষ আগে আর ধমতোরিতে দেখা যায়নি বক্তারা এ-কথাও বললেন। বিন্ধ্যাচলীর মতো একজন মানুষকে ভোট দিলে এ অঞ্চলের কী কী উন্নতি হবে, তাঁদের ভাষণে তার লম্বা ফিরিস্তি রয়েছে।

শুনতে শুনতে গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল লারউডের। বলে কী লোক-গুলো! তিনি কি ঠিক শুনছেন! দেশের দায়িত্বশীল এইসব মানুষ এক শয়তান বদমাস সম্পর্কে এরকম লম্বা লম্বা সার্টিফিকেট কি ভাবে দিতে পারে, তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না! বিন্ধ্যাচলী কি জাদু জানে! না কি এই লোকগুলোই 'পারচেজড্'? কিংবা বিন্ধ্যাচলীর ভয়েই এসব ভালো ভালো কথা বলে গেল! এই ক'বছরে মানুষের মর‍্যাল নষ্ট হয়ে গেছে?

সবার বক্তৃতা হয়ে যাবার পর বিন্ধ্যাচলী তার বক্তব্য শুরু করল। মাইকের সামনে এসে হাতজোড় করে ট্রাডিসনাল নেতাদের মতো সে বলল, 'আমি একজন সামান্য জনসেবক। আপনাদের সকলের সেবা করবার জন্য আমাকে একটা সুযোগ দিন। আপনারা জানেন সারা জীবন আমি একজন নির্যাতিত দেশকর্মী। বৃটিশ আমলে দেশসেবার মূল্য হিসেবে জেল খেটেছি—'

শুনতে শুনতে ভীষণভাবে চমকে উঠলেন লারউড। বলছে কী লোকটা! নিজের কানে শুনবার পরও যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না! এতক্ষণ তবু মুখ বুজে ছিলেন, কিন্তু যেই বিন্ধ্যাচলী বৃটিশ আমলে দেশসেবার জন্য জেল খাটার কথা বলল তখন আর চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা গেল না। ভিড় ঠেলে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন লারউড। তাঁর মাথার ভেতর কোথায় যেন একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেল। একেবারে মঞ্চের কাছে এসে হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মতো চিৎকার করে উঠলেন, 'বিলকুল ঝুট,

বিলকুল ঝুট! টোটালি ফলস স্টেটমেণ্ট!' বিন্ধ্যাচলীর দিকে আঙুল বাড়িয়ে গলার স্বর শেষ পর্দায় তুলে দিলেন লারউড, 'এই লোকটার একটা কথাও বিশ্বাস করবেন না। বৃটিশ আমলে আমিই একে জেলে পুরেছিলাম। দেশের কাজ করার জন্যে না; একটা লোককে মেরে ফেলতে যাচ্ছিল বলে। লোকটা খুনী, বদমাস, মিথ্যাবাদী, এক্সপ্লয়টার, পয়লা নম্বরের হারামজাদা,—' বলেই যেতে লাগলেন, 'বছরের পর বছর, জেনারেসনের পর জেনারেসন ধরে গরীব মানুষের রক্ত শোষণ করে চলেছে। এ আপনাদের প্রতিনিধি হতে পারে না।'

মীটিংটা মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল যেন। তারপরই কোত্থেকে যেন ভোলা দৌড়ে এলো। গলার স্বর ছিঁড়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'বড়ে সাব ঠিক বলেছে। আমাকেই মেরে ফেলতে যাচ্ছিল ঐ সিং। এই দেখুন—'বলেই গায়ের জামাটা খুলে ফেলল ভোলা। দেখা গেল পিঠ-বুক-গলা—সব জায়গায় চাবুকের লম্বা লম্বা কাটা দাগ শুকিয়ে কালো হয়ে আছে।

ভোলা বলতে লাগল, 'আমি অচ্ছুৎ হয়ে সিং-এর কুয়ো থেকে জল তুলে খেতে গিয়েছিলাম। তাই সিং আমাকে ঐভাবে চাবুক দিয়ে মেরেছে।' লারউডকে দেখিয়ে বলল, 'এই বড়ে সাব তখন এখানকার মেজিস্টর। উনি আমাকে ঐ সিং-এর হাত থেকে বাঁচিয়ে সিংকে জেলে পাঠিয়ে দেন।'

কোথায় কোন্ এক বারুদের স্তূপে যেন আগুন ধরিয়ে দিল ভোলা। সাহস পেয়ে মীটিং-এর নানা দিক থেকে একে একে আরো অনেকে মুখ খুলতে লাগল। বিন্ধ্যাচলী সিং কার কতটা ক্ষতি করেছে, কার ওপর কীধরনের অত্যাচার চালিয়েছে চিৎকার করে করে সবাই বলতে লাগল।

এদিকে বিন্ধ্যাচলী সিং-এর ইলেকসান এজেণ্টরা ওই লোকগুলোকে থামাবার জন্য হৈচৈ জুড়ে দিল। কিন্তু কেউ থামতে চায় না। ফলে গোটা মীটিং জুড়ে চিৎকার এবং পাল্টা চিৎকার শুরু হয়ে হাতাহাতি মারামারি লেগে গেল। উত্তেজিত জনতা এক সময় মঞ্চের দিকে বৃষ্টির

মতো ঢিল ছুঁড়তে লাগল।

এখানে দাঁড়িয়ে থাকা আর ঠিক হবে না। ভোলা আর বিনায়ক লারউড এবং নারায়ণদাসকে হাত ধরে টানতে টানতে হাজার হাজার উড়ন্ত পাথরের টুকরোর ভেতর দিয়ে মীটিংএর বাইরে নিয়ে এলো। কয়েক মিনিটের ভেতর বিন্ধ্যাচলী সিং-এর নির্বাচনী সভার দফা রফা হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পর ভোলার টাঙ্গায় করে বাড়ি ফিরছিলেন লারউড। হঠাৎ লাল রঙের একটা বড় ফোর্ড গাড়ি এসে টাঙ্গার সঙ্গে একই স্পীডে পাশাপাশি চলতে লাগল। একটু পর গাড়িটার জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বিন্ধ্যাচলী সিং লারউডকে বলল, 'আপনি খুব খারাপ কাজ করলেন স্যর। বার বার বলা সত্ত্বেও একজন ফরেনার হয়ে এ দেশের ইণ্টারন্যাল ব্যাপারে আপনি নাক গলিয়ে দিলেন।'

লারউড বললেন, 'যদি কিছু করেই থাকি মানুষের জন্যেই করেছি। যে দেশের লোকই আমি হই না কেন, পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের মানুষের ভালোর জন্য কিছু করার বা বলার অধিকার আমার আছে। যে কোন সৎ লোকেরই থাকা উচিত।'

দাঁতে দাঁত পিষে বিন্ধ্যাচলী সিং বলল, 'লম্বা লম্বা ফিলজফির কথা রাখুন সাহেব। একটু আগে যা করলেন তার ফল আপনাকে পেতেই হবে। শীগগিরই তা পাবেন।'

'তুমি তো আমাকে চেনো বিন্ধ্যাচলী। আমাকে ভয় দেখিয়ে লাভ হবে না।' লারউড সামান্য হাসলেন।

বিন্ধ্যাচলী আর কোন কথা বলল না। আরক্ত চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে দাঁতে দাঁত ঘষল। তার চোয়াল পাথরের মতো শক্ত হয়ে উঠতে লাগল। তারপর ঝট করে মুখটা গাড়ির ভেতর টেনে নিল সে পরক্ষণেই ফোর্ডটা ষাট মাইল স্পীড তুলে ঝাঁ করে বেরিয়ে গেল।

বাড়ি ফিরে ভয়ানক উত্তেজিতভাবে লারউড বললেন, 'এ হতে পারে না শুক্লাজী। বিন্ধ্যাচলীর মতো একটা বজ্জাতের হাতে কিছুতেই পলিটিক্যাল পাওয়ার তুলে দেওয়া যায় না। একটা কিছু ব্যবস্থা আপনারা করুন।'

নারায়ণদাস অসহায়ভাবে বললেন, 'আমি কী করতে পারি ?'

লারউড বললেন, 'আপনার কাছে এরকম উত্তর আশা করিনি। এক সময় দেশের স্বাধীনতার জন্যে না করেছেন কী! কত অত্যাচার সহ্য করেছেন, বছরের পর বছর জেল খেটেছেন। আজ সেই নারায়ণদাস শুক্লা বলছেন কিনা—কী করবেন ?'

'আমি আর কী বলতে পারি !'

লারউড উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, 'যেমন করে পারেন ঐ লোকটাকে আটকান। ডেভিলের হাতে পলিটিক্যাল পাওয়ার গেলে পীপলের সর্বনাশ হয়ে যাবে। আমি নতুন করে প্রি-ইণ্ডিপেনডেন্স পীরিয়ডের নারায়ণদাস শুক্লাকে দেখতে চাই—যিনি বৃটিশ রাইফেল আর জেল গ্রাহ্য করতেন না।'

নারায়ণদাসের মুখে মলিন একটু হাসি ফুটল। বললেন, 'সেই নারায়ণদাস মৃত।' খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ফের শুরু করলেন, 'স্যার আমার বয়েস সত্তর পেরিয়ে গেছে। চোখে ক্যাটারাক্ট, রক্তে সুগার আর প্রেসার, সারা গায়ে রিউম্যাটিজম। এখন তো আমি পুরোপুরি বাতিল মানুষ। তা ছাড়া এখনকার পলিটিক্সের বিশেষ কিছুই আমার মাথায় ঢোকে না। তিরিশ চল্লিশ বছরে আমরা যে ধরনের পলিটিক্স করেছি তার সঙ্গে এখনকার পলিটিক্সের একেবারে কোন মিল নেই। সব বদলে গেছে। আমি এই সেট-আপে টোটালি মিসফিট।'

লারউডের কপালে অনেকগুলো ভাঁজ পড়ল। একটু ভেবে তিনি

জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা বলতে পারেন—এম. এল. এ-র নমিনেশন সাবমিট করার লাস্ট ডেট কি চলে গেছে ?'

'যতদূর জানি এখনও যায়নি।'

'এই ধমতোরিতে বিন্ধ্যাচলী ছাড়া পীপল্‌স রিপ্রেজেণ্টেটিভ হবার মতো আর কি কোন লোক নেই? অনেস্টি ইণ্টেগ্রিটি, আর পার্সোনালিটি রয়েছে—এমন ত্ব-একজনের নাম বলুন না।'

খানিকক্ষণ চিন্তা করে নারায়ণদাস যা বললেন, সংক্ষেপে এই রকম। লারউড যেমনটি চাইছেন ধমতোরিতে তেমন মানুষ নিশ্চয়ই রয়েছেন। যেমন, রিটায়ার্ড ম্যাজিস্ট্রেট সীতারামজী, ডিস্ট্রিক্ট স্কুলের অ্যাসিস্টাণ্ট হেডমাস্টার রামনগিনজী, আর বার লাইব্রেরির প্রেসিডেণ্ট প্রবীণ চন্দ্রজী। এঁরা সবাই পা থেকে মাথা পর্যন্ত অনেস্ট। তা ছাড়া হাইলি এডুকেটেড ; নিয়মিত সোসাল ওয়ার্ক করেন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে এঁদের যথেষ্টই যোগাযোগ রয়েছে। নারায়ণদাসের মতে সত্যিকারের পীপল্‌স রিপ্রেজেণ্টেটিভ অর্থাৎ জনপ্রতিনিধি করতে হলে এঁদের মধ্যে থেকে একজনকে করা উচিত। তাতে ধমতোরির মানুষ উপকৃত হবে। কিন্তু এঁদের কেউ নির্বাচনে নামেননি।

লারউড সব শোনার পর বললেন, 'এঁরা কোথায় থাকেন ?'

ধমতোরি শহরের তিন প্রান্তের তিনটি ঠিকানা দিয়ে নারায়ণদাস বললেন, 'কী ব্যাপার স্যার—ঠিকানা দিয়ে কী হবে ?'

'ওঁদের সঙ্গে দেখা করব।'

'কেন ?'

'আপনি তো আর ইলেকসানে নামবেন না। দেখি ওঁদের কাউকে নামিয়ে বিন্ধ্যাচলীকে ঠেকানো যায় কিনা।'

সেদিনই সন্ধ্যের খানিকটা পর পর বিনায়ককে সঙ্গে নিয়ে ভোলার টাঙ্গায় ধমতোরির পুব মাথায় রিটায়ার্ড ম্যাজিস্ট্রেট সীতারামজীর বাড়ি এলেন লারউড।

লারউডকে দেখে সীতারামজী দারুণ খুশী। সসম্ভ্রমে তাঁকে আর বিনায়ককে বাড়ির ভেতর নিয়ে বসালেন।

পাতলা মেদহীন চেহারা সীতারামজীর। মাঝারি হাইট, টকটকে ফর্সা রঙ, চোখ মুখ এই বয়সেও কাটা-কাটা, মেরুদণ্ড টান-টান। তার পরনে মোটা হ্যাণ্ডলুমের পাজামা-পাঞ্জাবি। এত বয়সেও চোখ বেশ ভালো আছে ; চশমার দরকার হয়নি।

প্রথমে এলোমেলো খানিকক্ষণ গল্প হল। কথায় কথায় জানা গেল, লারউড সীতারামজীকে না চিনলেও সীতারামজী কিকআতোঁ স্তেতেগ থেকেই চেনেন। আরো জানা গেল, সীতারামজী ধমতোরির মানুষ হলেও ভূপালে মামার বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করতেন। পরে ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে এখানকার একটা কলেজে লেকচারারশিপ যোগাড় করে নিয়েছিলেন। স্কুল-কলেজে পড়বার কিংবা পরে পড়াবার সময় মাঝে-মধ্যে ছুটিছাটায় মা-বাবা-ভাইবোনদের দেখতে আসতেন। তখন লারউডকে বেশ কয়েকবার দেখেছেন, তবে আলাপটা হয়ে ওঠেনি। ইণ্ডিপেনডেন্সের আগে যেবার লারউড এদেশ ছেড়ে চলে যান সে বছরই কমপীটিটিভ পরীক্ষা দিয়ে জুডিসিয়ারিতে ঢুকেছিলেন সীতারামজী। প্রথমে পোস্টিং ছিল ভূপালে। পরে নানা সাবডিভিসনে ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত নিজের হোম টাউন ধমতোরিতে এসে রিটায়ার করেছেন।

সীতারামজীর ব্যক্তিগত কিছু কথাও জানা গেল। যৌবনের মাঝামাঝি সময়ে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু তাঁর বিবাহিত জীবনের আয়ু মোটে দু বছর। ক্যানসারে স্ত্রীর মৃত্যুর পর বাবা-মা আত্মীয়স্বজনরা অনেক বুঝিয়েছেন কিন্তু তাঁকে দ্বিতীয় বার বিয়ে করানো যায়নি।

এখন জীবনের লম্বা ম্যারথন রেস শেষ করার মুখে ছোট ভাইদের সংসারে থাকেন সীতারামজী আর সময় কাটাবার জন্য ধমতোরি শহরে ঘুরে ঘুরে কিছু সোসাল ওয়ার্ক করেন। 'বয়স্ক শিক্ষা' বাড়াবার জন্য একটা স্কুল খুলেছেন তিনি। খুব গরীব স্তরের মজুর-শ্রমিক ক্লাসের

বুড়ো-আধবুড়ো লোকেরা তাঁর ছাত্র। সারাদিন কাজকর্মের পর তারা তাঁর কাছে পড়তে আসে।

যাই হোক, নানা কথার ফাঁকে একসময় সীতারামজী বললেন, 'আপনি যে এসেছেন আর নারায়ণদাসজীদের বাড়ি আছেন, সে খবর আমি আগেই পেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, দু-চারদিনের ভেতর আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাব।'

লারউড হাসলেন। মজা করে বললেন, 'তার আগেই কষ্ট করে আমিই চলে এলাম।'

'দয়া করে আপনি যে এসেছেন সে জন্য আমি খুবই কৃতজ্ঞ।'

'আমিও খুব কৃতজ্ঞ হব যদি দয়া করে আপনি আমার একটা অনুরোধ রাখেন।'

লারউড কোন্‌দিকে যাচ্ছেন ঠিক বুঝতে না পেরে সীতারামজী বললেন, 'কী অনুরোধ বলুন তো—'

লারউড সোজাসুজি আসল কথায় চলে এলেন, 'বিন্ধ্যাচলী সিংকে আপনি নিশ্চয়ই চেনেন।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, চিনি বৈকি। এবার তো সে ইলেকসানে নামছে।'

'লোকটাকে কিরকম মনে হয়?'

'কিরকম বলতে?'

'মানে পীপল্‌স রিপ্রেজেণ্টেটিভ হবার যোগ্যতা ওর আছে?'

একটু চিন্তান্বিতভাবে সীতারামজী বললেন, 'আমি ঠিক বলতে পারব না। ওর সঙ্গে তেমন পরিচয় বা ঘনিষ্ঠতা নেই। তবে শুনেছি লোকটা খুব ভালো না।'

লারউড বললেন, 'আমি ওকে খুব ভালো করে চিনি। ইণ্ডিপেন-ডেন্সের আগে থেকে দেখে আসছি। ওর হাড়ের ভেতর কতখানি শয়তানি ঠাসা আছে আমার চাইতে কেউ তা বেশি জানে না। ওর মতো একটা হারামজাদা ধমতোরির রিপ্রেজেণ্টেটিভ হতে পারে না। ওকে যেমন করে হোক আটকাতেই হবে। আমার অনুরোধ, আপনি

ওর এগেনস্টে ইলেকসানে দাঁড়ান।'

সীতারামজী চমকে উঠলেন, 'কী বলছেন আপনি! আমি ইলেক্সান কনটেস্ট করব!'

ধমতোরির ভালোর জন্য করতেই হবে। নইলে একটা ডেভিল জনসাধারণের প্রতিনিধি হয়ে যাবে।'

'কিন্তু—'

'কী?'

'আমি তো পলিটিক্স বুঝি না। এর ভেতর আমার একেবারেই যাবার ইচ্ছা নেই। ইটস এ ডার্টি গেম নাউ-এ-ডেজ।'

'আবর্জনা সরাবার জন্যেই তো আপনাদের মতো মানুষের রাজনীতিতে আসা দরকার সীতারামজী।'

'আমি পারব না স্যার। আপনি জানেন না, ইলেক্সান কনটেস্ট করতে হলে এখন কী কী করা দরকার। আমার পক্ষে তা একেবারেই সম্ভব না। সোস্যাল ওয়ার্ক নিয়ে আছি, এতেই আমি খুশী। ইলেক্সানে নামা ছাড়া আর যা বলবেন আমি তাতেই রাজী। আমাকে ক্ষমা করবেন স্যার।'

লাবউড অনেকবার বোঝালেন কিন্তু সীতারামজী কিছুতেই নির্বাচনে নামতে রাজী হলেন না।

১৬

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে চা এবং টোস্ট খেয়ে বিনায়ককে নিয়ে লারউড সোজা চলে এলেন ধমতোরি শহরের পুবের মহল্লায়। এখানেই ডিস্ট্রিক্ট স্কুলের রিটায়ার্ড অ্যাসিস্টান্ট হেড মাস্টার রামনগিনজীর বাড়ি।

লারউড যখন ধমতোরিতে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন তখন রামনগিনজীকে ত্যাখেননি। রামনগিনজী জব্বলপুরের দিককার মানুষ। লারউড এ দেশ ছেড়ে চলে যাবার তিন-চার বছর বাদে অর্থাৎ

স্বাধীনতার পর ধমতোরির ডিস্ট্রিক্ট স্কুলে কাজ নিয়ে আসেন।

রামনগিনজীর বয়স খুব যে একটা বেশি হয়েছে তা নয়। এই চৌষট্টি-পঁয়ষট্টি। কিন্তু নানা ধরনের স্থায়ী অসুখবিসুখে তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। রোগা অসুস্থ দুর্বল চেহারার এই মানুষটিকে বয়সের তুলনায় অনেক বৃদ্ধ দেখায়। দু'পা হাঁটতে গেলে হাঁপিয়ে পড়েন ; কথা বলতেও তাঁর যেন কষ্ট হয়।

স্ত্রী, পাঁচ ছেলে, ছেলেদের বউরা এবং দশ-বারোটি নাতি-নাতনী নিয়ে রামনগিনজীর বিরাট সংসার। বাড়ির প্রতিটি মানুষ সর্বক্ষণ তাঁর শরীর স্বাস্থ্যের দিকে নজর রেখেছে। যাতে তাঁর কোন অনিয়ম না হয়, কোন কারণে উত্তেজিত হয়ে না পড়েন, সে জন্য সবাই সতর্ক হয়ে থাকে।

আলাপ-পরিচয় হবার পর লারউড তাঁর আসার কারণটা জানালেন।

রামনগিনজী সামান্য হাসলেন। বললেন, 'আমাকে তো দেখেছেন। এরকম একটা অকেজো লোকের পক্ষে সাধারণ মানুষের এত বড় দায়িত্ব নেওয়া কি সম্ভব? আমাকে দয়া করে বাদ দিন। আমি পৃথিবী থেকে বাতিল হয়ে গেছি।'

এমন মানুষের ওপর জোর করা চলে না। অগত্যা লারউডদের উঠে পড়তে হলো।

রামনগিনজীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে ধমতোরির 'বার লাইব্রেরি'র প্রেসিডেন্ট প্রবীণচন্দ্রজীর বাড়ি এলেন লারউডরা।

এঁর সঙ্গেও আগে পরিচয় ছিল না। প্রবীণচন্দ্রজীর আদি বাড়ি বিলাসপুরের কাছাকাছি এক দেহাতে। লারউড চলে যাবার পর তিনিও ধমতোরিতে এসেছিলেন।

প্রবীণচন্দ্রজী বিশাল চেহারার পুরুষ। নিঃসন্তান। স্ত্রী এবং তিনি— সংসারে এই দুজন ছাড়া আর কেউ নেই। স্বামী-স্ত্রীর টাকা-পয়সা বা ভোগবিলাস সম্পর্কে বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই। ছেলেপুলে না থাকায়

সংসার সম্পর্কে তাঁদের আগ্রহ এবং আসক্তি দ্রুত কমে যাচ্ছে। কোর্টের কাজটুকু ছাড়া স্বামী-স্ত্রী সর্বক্ষণ সাধু-সন্ন্যাসী মঠ-মন্দির, গীতা-উপনিষদ বা বেদ-টেদ নিয়েই মগ্ন থাকেন।

পুরনো চালের মানুষ প্রবীণচন্দ্রজী। মোটর গাড়ি কেননি। একটা ফীটন আছে তাঁর। টগবগে চেহারার সাদা ধবধবে একটা জোয়ান ঘোড়া সেটাকে ঝড়ের গতিতে টেনে নিয়ে যায়।

ফীটনে করে কোর্টে যান প্রবীণচন্দ্রজী। কোর্ট থেকে ফিরে চা-টা খেয়ে স্ত্রীকে নিয়ে ধমতোরি শহরের নির্জন প্রান্তে এক মঠে হাজিরা দেন। সেখানে রোজ গীতা বা উপনিষদ পাঠের আসর বসে।

লারউড তাঁর আসার উদ্দেশ্য জানিয়ে প্রবল আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে রইলেন।

প্রবীণচন্দ্রজী হেসে বললেন, 'আপনি ভুল জায়গায় এসেছেন মিস্টার লারউড। আমার পক্ষে ইলেকসান কনটেস্ট করতে যাওয়া সম্ভব না।'

'কেন ?'

প্রথমত পলিটিক্স হলো ডার্টি গেম। তা তাড়া টাকাপয়সা, রাজনৈতিক ক্ষমতা—কোন ব্যাপারেই আমাব এতটুকু অ্যাট্রাকসান নেই।'

'কিন্তু আপনারা থাকতে এই দেশ, দেশের মানুষ —সব বিন্ধ্যাচলী সিংয়ের মতো একটা শয়তানের পায়ের তলায় চলে যাবে ?'

'আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি মিস্টার লারউড, কিন্তু দেশে অন্য কর্মক্ষম ও আইডিয়ালিস্ট মানুষও তো আছে। আমি রাজনীতিতে যেতে চাই না। পলিটিক্সের চাইতে অনেক বেশি এক্সাইটিং এবং এনচ্যান্টিং কিছু আমি খোঁজ করে বেড়াচ্ছি।'

'কী সেটা ?'

'ধর্ম।'

লারউড অনেক বোঝালেন কিন্তু প্রবীণচন্দ্রজীকে টলানো গেল না।

১৭

দেখতে দেখতে আরেক রবিবার এসে গেল। আজ এখানকার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোয় লারউডের খাওয়ার নেমন্তন্ন। আটটা বাজতে না বাজতেই মিস্টার এবং মিসেস নরোনহা নিজেরা এসে লারউডকে তাঁদের গাড়িতে করে নিয়ে গেলেন।

সারাদিন প্রচুর গল্পটল্প এবং খাওয়াদাওয়া চলল। সন্ধ্যার আগে আগে লারউডকে নারায়ণদাসদের বাড়িতে পৌঁছে দেবার সময় দ্বিধান্বিত ভঙ্গিতে নরোনহা হঠাৎ ডাকলেন, 'স্যার—'

লারউড তাঁর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিছু বলবে?'

নরোনহা মুখ নামিয়ে আস্তে মাথা নাড়লেন।

লারউড বললেন, 'কী?'

নরোনহা উত্তর দিলেন না; নতমুখে বসেই থাকলেন।

লারউড এবার তাড়া লাগালেন, 'কী হলো? খারাপ কিছু নাকি?'

নরোনহা মুখ তুলে হাতজোড় করলেন, 'হ্যাঁ, আমার ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে। আই অ্যাম রিয়ালি আনহ্যাপি। নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে।'

লারউড নরোনহার কাঁধে একটা হাত রেখে সস্নেহে বললেন, 'তুমি বলো তো। আমি কিচ্ছু মনে করব না।'

'স্যার, এই ধমতোরি থেকে আপনার বিরুদ্ধে কয়েক শো টেলিগ্রাম গেছে।'

লারউড চমকে উঠলেন, 'আমার বিরুদ্ধে?'

নরোনহা বললেন, 'হ্যাঁ স্যার—'

'আমার অপরাধ?'

'আপনি নাকি এদেশের ইন্টার্নাল ব্যাপারে, বিশেষ করে পলিটিক্সে অত্যন্ত আপত্তিকরভাবে মাথা ঘামাচ্ছেন। ফলে এখানকার পলিটিক্যাল সেট-আপ খুবই বিপন্ন হয়ে পড়ছে।'

লারউড বিমূঢ়ের মতো অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর বিষণ্ণ স্বরে বললেন, 'কিন্তু তুমি তো স্বীকার করবে আমার মতো ইণ্ডিয়ার শুভাকাঙ্ক্ষী খুব বেশি নেই।'

'করি স্যার।'

'এ দেশের ক'জন লোক আমার মতো তাদের দেশকে ভালোবাসে?'

'জানি স্যার ; ভেরি ফিউ।'

'আমি তো বিন্ধ্যাচলী সিংয়ের মতো ফিউডাল 'রোগ'দের হাত থেকে এ দেশকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম। এটাকে তুমি ইন্টারফিয়ারেন্স বলো? একজন মানুষ হিসেবে, সিটিজেন অফ দি ওয়ার্ল্ড হিসেবে এটা আমার, তোমার বা যে কোন লোকের ডিউটি নয়?'

'নিশ্চয়ই।'

একটু চুপ। তারপর লারউড জিজ্ঞেস করলেন, 'কারা এ সব টেলিগ্রাম পাঠালো?'

নরোনহা বললেন, 'কারা পাঠাতে পারে নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পারছেন। নিজের দেশের লোকের সম্পর্কে আমি আর কী বলব?'

'টেলিগ্রামগুলো পেয়ে দিল্লীর রি-অ্যাকসান কী?'

'স্যার, আমার অপরাধ নেবেন না। দিল্লীতে আপনাদের হাই-কমিশন আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আমার কাছে নির্দেশ এসেছে সম্ভব হলে আজ, নইলে কাল আপনার দিল্লী যাওয়ার ব্যবস্থা যেন করে দিই।'

মিসেস নরোনহা বললেন, 'এ অন্যায়, খুব অন্যায়।'

লারউড উত্তেজিত হলেন না। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে খুব শান্তভাবে বললেন, 'আমার দিল্লী যাবার ব্যবস্থা হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'আজই?'

'না, কাল।'

'বেশ।' বলে একটু থামলেন লারউড। পরক্ষণেই আবার শুরু

করলেন, 'বিন্ধ্যাচলীকে একটা খবর দিতে পারবে?'

নরোনহা বললেন, 'নিশ্চয়ই।'

'বোলো তার মনস্কামনাই পূর্ণ হোক।' বলে হাসলেন লারউড।

নরোনহা ফের হাতজোড় করে বললেন, 'স্যার, আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি খুব সামান্য অফিসার। আমার কিছু করার ক্ষমতা নেই।'

লারউড তাঁর কাঁধে হাত রেখে গভীর আবেগে বললেন, 'ডোণ্ট ওরি মাই সান। তোমার আর—' মিসেস নরোনহাকে দেখিয়ে বলতে লাগলেন, 'আমার এই মেয়েটির কাছ থেকে যে প্রীতি আর ভালবাসা পেয়ে গেলাম জীবনে ভুলব না। গড ব্লেস ইউ।'

১৮

পরের দিন বিকেলে দিল্লী যাবার জন্য ভোলার টাঙ্গায় স্টেশনে এলেন লারউড।

কয়েক ঘণ্টার ভেতর কীভাবে যেন গোটা ধমতোরিতে জানাজানি হয়ে গেছে, বিন্ধ্যাচলী সিংয়ের কারসাজিতে এ শহর ছেড়ে লারউডকে চলে যেতে হচ্ছে। ফলে গোটা শহরটা প্ল্যাটফর্মে ভেঙে পড়েছে যেন।

লারউডের টাঙ্গার পেছন পেছন মিস্টার এবং মিসেস নরোনহা তাঁদের গাড়িতে এসেছেন। ওঁরাই তাঁকে স্টেশনে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন। ভোলা তার দাবী ছাড়েনি।

লারউডের সঙ্গে নারায়ণদাস, দুর্গাবতী, বিনায়ক এবং মাধুরীও এসেছেন। এমন কি খবর পেয়ে অসুস্থ রাহুলজীও সুষমাকে নিয়ে চলে এসেছেন।

সবার মুখ বিষাদে ছেয়ে আছে। ভোলা আর ধনেরিলাল তো অবোধ বালকের মতো কেঁদে যাচ্ছিল।

লারউড হাতজোড় করে সবার কাছ থেকে বিদায় নিতে লাগলেন।

এ জীবনে এই মানুষগুলোর সঙ্গে হয়তো আর দেখা হবে না। তাঁরও দু চোখ জলে ভরে যেতে লাগল।

সবার কাছ থেকে বিদায় নেবার পর সুষমাকে নিয়ে মাধুরী আর দুর্গাবতীর কাছে এলেন লারউড। বললেন, 'এই মেয়েটা এখন থেকে আপনাদের। বিনায়ক আর ওর বিয়ের সময় আমাকে একটা খবর দেবেন।'

আবছা ধরা গলায় দুর্গাবতী বললেন, 'নিশ্চয়ই দেব। আপনি ওদের আশীর্বাদ করুন।'

'সব সময়ই করছি।'

লারউড সবার সঙ্গে কথা বলছিলেন ঠিকই কিন্তু অদৃশ্য কাঁটার মতো বিন্ধ্যাচলী সিং তাঁর অস্তিত্বের মধ্যে কোথায় যেন বিঁধে আছে। এবার বিনায়কের দিকে ফিরে বললেন, 'চলি। সুষমাকে দেখো।' একটু থেমে ফের বললেন, 'যাবার সময় একটা শুধু দুঃখ থেকে গেল—' বলতে বলতে চুপ করে গেলেন।

বিনায়ক যেন এতক্ষণ তাঁর কথা শুনছিল না। গভীর চিন্তায় মগ্ন এই যুবকটি দুরমনস্কর মতো একধারে দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ সে বলল, 'আমি একটা ব্যাপার ঠিক করে ফেলেছি।'

লারউড বললেন, 'কী ?'

'ইলেকসানে কনটেস্ট করব। আপনি আমার চোখ খুলে দিয়েছেন। বিন্ধ্যাচলীর মতো একটা কুৎসিত ফিউডাল টাইর্যান্টের হাতে কখনই পলিটিক্যাল পাওয়ার তুলে দেওয়া উচিত নয়।'

সারা মুখ ঝলমলিয়ে উঠল লারউডের। আগুনের একটি ঊর্ধ্বমুখ শিখা নিয়ে ক'দিন ধরে তিনি ধমতোরির দুয়ারে দুয়ারে হানা দিয়েছেন কিন্তু কোথাও আলো জ্বালতে পারেননি। কে জানত, চলে যাবার মুহূর্তে ধমতোরি স্টেশনের এই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে সেই ইপ্সিত আলোটি জ্বালিয়ে যেতে পারবেন।

উত্তেজিতভাবে বিনায়কের একটি হাত নিজের মুঠোয় তুলে নিলেন

লারউড। কাঁপা গলায় বললেন, 'গ্র্যাণ্ড। তোমার সাকসেসের জন্য আগে থেকেই অভিনন্দন জানিয়ে রাখলাম। গড ব্লেস ইউ।'

বিনায়ক বলল, 'আমি কি জিততে পারব?'

'নিশ্চয়ই পারবে। দেশের মানুষ নিজেদের শুভাকাঙ্ক্ষীকে চিনতে নিশ্চয়ই ভুল করবে না।'

এক সময় ট্রেন এসে গেল। একটা ফার্স্ট ক্লাস কামরায় উঠলেন লারউড। এখন তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। বিনায়ককে যে পুরনো ফিউডাল সিস্টেমের প্রতিনিধি বিন্ধ্যাচলী সিংয়ের মতো একটা জঘন্য চরিত্রের শয়তানের বিরুদ্ধে নামাতে পেরেছেন, এতেই তিনি খুশী। পৃথিবীর ভার আর যাই হোক ছুঁচো পেঁচা বা শিয়াল শকুনের হাতে তুলে দেওয়া যায় না।

—